শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

# অমৃতস্য পুত্রাঃ

অমৃতস্য পুত্রাঃ প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ

# এক

জনপূর্ণ পৃথিবীতে জনতাই স্বাভাবিক। মানুষের মধ্যে সমাজ-গঠনের প্রবৃত্তি স্বাভাবিক হইলেও অনেকগুলি মানুষ মিলিয়া একসঙ্গে জমাট বাঁধিবার আর নিশ্বাস, গায়ের গন্ধ, সংক্রামক রোগ, কড়া কথা, এই সব আদানপ্রদান করিবার সাধ মানুষের কেন থাকিবে, সে কথাটা যারা ঘরের কোনায় বসিয়া ছাপানো কাগজের পাতা হইতে দু চোখ দিয়া জ্ঞান শুষিয়া শুষিয়া হয় মানবতত্ত্ববিদ্, তাদের বিবেচ্য। পিঁপড়াও ভিড় জমায়, কেবল গুড়ের চারিদিকে নয়, সকলে মিলিয়া সকলের চেষ্টায় যাতে সকলে বাঁচিতে পারে, সেই জন্য। পাখা ওঠার পর একা একা পাখায় ভর দিয়া পিঁপড়া তাই স্বর্গে যায়।

যেখানে যত বেশি মানুষ যত বেশি জমাট বাঁধে আর প্রত্যেক দিন যত বেশি উপলক্ষে যত বেশি জনতা হইয়া আসে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ, সেখানটা তত বড়ো শহর। স্কুল কলেজে ক্লাস বসে রোজ, দশটায় খোলে আপিস, সভাসমিতির অধিবেশন হয় হরদম, খেলার মাঠে দশ বিশ পঁচিশ রকমের খেলা বাদ যায় না একদিনও, প্রত্যেকটি সিনেমায় প্রত্যেক দিন একটি প্রবেশপত্র কিনিতে চায় দশজনে, রেস্তরাঁয় চা চপ খায় সকলে, কাফে-ডি-অমুকে দু-একটা ভঙ্গুর বোতলের অবাস্তবতার স্বর্গে উঠিয়া প্যাডোচ্চ-মধ্যা সমতল-বক্ষা উর্বশীর সঙ্গে নাচে অনেকেই, বাজারে চলিতে থাকে আলু-পটল বিক্রি, দাওয়ায় বা বাহিরের ঘরে চলিতে থাকে আড্ডা, অন্তঃপুরে একটা মানুষের দশভাগের একভাগ থাকিতে পারে যে স্থানটুকুতে সেখানে বাস করে দশজন—

দশজনের একজনও পুরা মানুষ নয়, তাই রক্ষা।

হয়তো মানুষ নয়।

অনুপম আর শঙ্কর দুজনেই কলেজ যাইতেছিল। অনুপম যাইতেছিল বাসে আর শঙ্কর যাইতেছিল বাড়ির মোটরে। একটা প্রকৃত ও প্রকাণ্ড চৌমাথায়, চারিদিকের চারটি পথবাহী গাড়িঘোড়া ও মানুষের দ্রুতগতির মধ্যেই যেখানে প্রগতির লক্ষণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়, আর যেখানে কাগজ ফেরিওয়ালাদের বগলে দু-চার পয়সা দামের সংবাদরূপী বিশ্বকে কিনিতে পাওয়া যায় দু-চার পয়সা দাম দিয়া, সেই চৌমাথায় লাল আলোর ইঙ্গিতে বাস আর মোটরটি পাশাপাশি থামিয়া গেল।

প্রকাণ্ড দোতলা বাস, বসিবার আসনগুলি বাদ দিলে একটি পরিবারের চমৎকার বাসগৃহ হইতে পারে। অনুপম কোণে বসে নাই, নীচের তলায় মাঝখানের একটি আসনে কোণঠাসা অবস্থায় জানালা দিয়া চাহিয়াছিল পথের দিকে। মোটরটির পিছনের সিটে ট্রাউজার-ঢাকা দুই হাঁটুর উপর কনুই আর কামানো গালে হাতের তালু রাখিয়া বসিয়া ছিল শঙ্কর আর তার পাশে বসিয়াছিলেন তার সাড়ে তিয়াত্তর বছরের ঠাকুরদাদা বীরেশ্বর।

কয়েক হাত তফাতে বাসের জানালায় অনুপমের মুখখানি দেখিয়া ঠাকুরদাদা বীরেশ্বর চিনিতে পারিলেন। ডাকিয়া বলিলেন, অনুপম না ? ও অনুপম !

চোখাচোখি হইয়াছিল কয়েক সেকেন্ড আগেই। বাসের জনতায় অজ্ঞাতবাসী অনুপম মানুষ চেনার ব্যাপারে একটু কাঁচা, এতগুলি মানুষের মধ্যে এতক্ষণ সে যে নিজেকে স্বতন্ত্র, একা, অসহায় আর ছেলেমানুষ বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে চেনা জগতের কাছে অজ্ঞাতবাসীর নিজেকে অচেনা করিয়া রাখার মতো, নিজের মনের সুপরিচিত অংশটুকুর কাছে নিজেকে অপরিচিত করিয়া তুলিতেছিল,

বছর তিনেক আগে দেখা একজন বুড়োকে এতকাল পরে চোখে দেখামাত্র মনে পড়ার মানসিক প্রক্রিয়াটিকে সে ভাবনা একটুও প্রশ্রয় দেয় না।

অনুপম বলিল, আপনি কে ?

বীরেশ্বর ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, আগে নেমে আয়, তারপর বলছি আমি কে। নাম, নাম, শিগগির নাম।

জীবনে আর কখনও তো এমন ঘটনা ঘটে নাই। এমন দামি মোটরের আরোহী, ধূসর রঙের দামি কাপড়ে তৈরি চাপকানের মতো লম্বা এ রকম কোট গায়ে সাদা গোঁফদাড়িতে এ রকম ঋষির মতো মুখওয়ালা, এমন সম্ভ্রান্ত চেহারার বৃদ্ধ জীবনে আর কবে অনুপমকে নাম ধরিয়া ডাকিয়া বাস হইতে নামিতে বলিয়াছে ? যানবাহনের গতি-নিয়ামক যন্ত্রের লাল আলো এতক্ষণে নীল রঙে পরিবর্তিত হইয়া যাওয়ায় বাস চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অনুপম নামিবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়া দিল। মানুষ ঠেলিয়া বাস হইতে নামিবার অভ্যাস তার অনেক দিনের, তবু, মোড়ের অন্যপ্রান্তে পৌঁছোনোর আগে মাটিতে পা দেওয়া সেও সম্ভব করিয়া তুলিতে পারিল না। হাতে বই, মুখে ব্রণ, কালো একটি মেয়ের কাছে মাথা তার কাটা গিয়াছে লজ্জায়, পা মাড়াইয়া দেওয়ায় একজন প্রৌঢ়বয়সি ভদ্রলোক ছোটোলোকের মতো কী যেন বলিয়াছেন অপমানকর, বাস হইতে নামার জন্য বীরেশ্বরের হুকুমের অজানা রহস্য মনের মধ্যে হইয়া উঠিয়াছে আরও গভীর, তবু বাসের টিকিটের পয়সা ক-টা নষ্ট হওয়ার কথাটাই যেন খচখচ বিঁধিতে লাগিল অনুপমের মনে। আবার টিকিট করিতে হইবে। আবার দিতে হইবে চার চারটা পয়সা।

মোটর গাড়িটি বাসের পিছুপিছু আগাইয়া আসিয়াছিল, পাশে থামিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে পিছনের কুড়ি-বাইশটা গাড়ির হর্নে বাজিয়া উঠিল বিরক্তির আওয়াজ।

বীরেশ্বর বলিলেন, আয় অনুপম, ভেতরে আয়।

অনুপম ভিতরে গিয়া বসিল। চেনা মানুষ সন্দেহ নাই, কিন্তু চেনা যায় না কেন ? এতক্ষণ এটা খেয়াল থাকে নাই, এবার পাশে বসিয়া বীরেশ্বরের গোঁফদাড়িতে ঢাকা মুখখানায় অপরিচয়ের আবরণ সরাইতে না পারিয়া হঠাৎ লজ্জায় অনুপম একেবারে যেন কাবু হইয়া গেল।

চেনা মানুষকে না চিনিতে পারার লজ্জা। প্রণামকে প্রণাম করার বদলে মনের ভুলে তার গালে একটা চড় বসাইয়া দেওয়ার মতো এ যেন একটা সাংঘাতিক অপরাধ।

বীরেশ্বর বলিলেন, আমি চিনলাম, তুই আমাকে চিনতে পারলি না অনু ? আজকালকার ছেলে তোরা, তোদের কাণ্ডই আলাদা। মনের মধ্যে হাজার রকম চিন্তা আর স্মৃতির খিচুড়ি পাকাস, একটাও স্পষ্ট হতে পারে না। আমি হলাম তোর ঠাকুরদা।

একটু হাসিলেন বীরেশ্বর, অত দাড়িগোঁফের জঙ্গলেও হাসিটা দেখা গেল। হঠাৎ খুশি হইয়া অনুপম বলিল, চিনেছি।

কে বল তো আমি ?

আপনি সীতা পিসিমার বাবা।

তোর বাবার বাবা নই ?

এটা পরিহাস। নিজের কথায় বীরেশ্বর নিজেই হাসিলেন, কিন্তু অনুপমের অত সহজে হাসি আসে না। মনের মধ্যে হাসির যে কারখানা আছে সেটার অনেকগুলি কল বিগড়াইয়া গিয়াছে, মনটাও কি হইয়া যায় নাই গোলকধাঁধার মতো এলোমেলো রকমের বাঁকা ? সংক্ষেপে সে শুধু বলিল, হ্যাঁ।

হ্যাঁ ? শুধু হ্যাঁ ? আমি হলাম তোর ঠাকুরদা, শুধু হ্যাঁ বলে আমার কথার জবাব দিলে পাপ হয়।—এ তোর রামলাল কাকার ছেলে শঙ্কর। কাকার ছেলের সঙ্গে কী সম্পর্ক হয়, তা তো

জানিস ? কে জানে বাবা, কী যে জানিস আর কী কী যে জানিস না, ভগবানও তা জানেন না। বলেই দিই,—কাকার ছেলে হয় খুড়তুতো ভাই। দুজনে যে হাঁ করে তাকিয়ে রইলি মুখের দিকে ?

শঙ্কর বলিল, আপনাকে দেখেছি মনে হচ্ছে।

অনুপম বলিল, আমারও মনে হচ্ছে আপনাকে দেখেছি।

শঙ্কর বলিল, আপনার কোন ইয়ার ?

অনুপম বলিল, ফোর্থ ইয়ার—সাইন্স। আপনার ?

শঙ্কর বলিল, আমারও ফোর্থ ইয়ার—আর্টস।

বীরেশ্বর দুজনের আলাপ শুনিতেছিলেন। হঠাৎ ড্রাইভারকে গাড়ি ঘুরাইয়া বাড়ি ফিরিবার হুকুম দিলেন।

শঙ্কর ব্যস্ত হইয়া বলিল, কলেজ যাব না ?

বীরেশ্বর গম্ভীর মুখে বলিলেন, চুলোয় যাক তোর কলেজ। বাড়ি ফিরে দুজনকে একটা ঘরে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে দেব। যতক্ষণ আপনি আপনি করে তোরা কথা বলবি, তালা খুলব না। আমার নাতি তোরা, ভাইকে আপনি বলতে লজ্জা করে না তোদের ? বয়সের কত তফাত জানিস তোদের ? একুশ দিন।

তাদের মধ্যে কে একুশ দিনের বড়ো কে একুশ দিনের ছোটো, বীরেশ্বরকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার সাধ অনুপমেরও দেখা গেল না, শঙ্করেরও দেখা গেল না। বাসের চারটা পয়সা নষ্ট হওয়ার শোক অনুপমের মনে মিলাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু কলেজ না গেলে যে পার্সেন্টেজগুলি আজ নষ্ট হইবে, সে অপচয় তার কাছে আরও শোচনীয়। অসুখে ভুগিয়া তার অনেক পার্সেন্টেজ নষ্ট হইয়াছে, নন-কলেজিয়েট হইয়া পরীক্ষা দিতে হইলে দুঃখের সীমা থাকিবে না অনুপমের, দশটা টাকাও বেশি লাগিবে। তবু, প্রতিবাদ করার বদলে সে চুপ করিয়া রহিল, গাড়ি ফিরিয়া চলিল যে পথে আসিয়াছিল সেই পথে। ক্ষতি ? ক্ষতির ভাবনাকেই আজ অনুপমের উপভোগ্য মনে হইতেছে। জীবনে একদিন বেহিসাবি কাজ করিয়া লোকসান হইয়াছে বলিয়া জীবনটা কি একদিনের জন্য ধন্য হইয়া যাইবে না ? কলেজের পার্সেন্টেজের ক্ষতির চেয়ে বড়ো রকম একটা ক্ষতি আজ হইতে পারে না ? পকেটে একটা দশ টাকার নোটও নাই যে রাস্তায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয় ! পকেটে হাত ঢুকাইয়া নস্যের কৌটাটি বাহির করিয়া আনিতে গিয়া আবার খালি হাতটাই অনুপম বাহির করিয়া আনিল।

সে জানে, এ সাময়িক বৈরাগ্য নয়, অস্থায়ী পাগলামি, মন অস্থির হইলে এ রকম হয়। নস্যের ডিবা ছুঁড়িয়া নয়, মানসিক অস্থিরতা চরমে উঠিয়া কত মানুষের কাছে সন্ন্যাসী হওয়া সহজ করিয়া দিয়াছে।

বড়ো তিনতলা বাড়ি, সামনে ছোটো একটা বাগান। শহরের এই অংশ নির্জন ও গম্ভীর, কারণ, একটা বাড়িও বাগানবাড়ি নয়, পথের দুদিকের প্রায় সবগুলিই সামনে বাগানওয়ালা বাড়ি। বাড়িগুলি যেমনই হোক, বাগানগুলি যেন বেঁটে বেঁটে উদ্ভিদের সাজানো গোছানো দোকান, অল্প একটু জায়গায় যতগুলি সম্ভব অরণ্যানীর প্রতিনিধিকে ঠাঁই দেওয়া হইয়াছে। দেখিয়া হয়তো কারও চোখ জুড়ায়। জগতে অন্ধ যত আছে, চোখ-থাকিতে-অন্ধের সংখ্যা তো তার চেয়ে কম নয়।

ইতিমধ্যে অনুপম ও শঙ্কর পরস্পরকে তুমি বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় দুজনকে একটা ঘরে তালা বন্ধ করিয়া রাখার সংকল্প বীরেশ্বরের আর দেখা গেল না। দুজনকে তিনি লইয়া গেলেন দোতলার অন্দরে, যেটা আসবাবে ঠাসা প্রকাণ্ড একটা ঘর এবং যেখানে দুপুরবেলা বাড়ির মেয়েরা খেলে তাস এবং পাড়ার মেয়েরা বেড়াইতে আসিলে বসে মজলিশ।

সীতা পিসিমাই আগে আসিলেন। মাঝবয়সি বিধবা মানুষ তিনি, পরনে তাই ধবধবে সাদা হাতকাটা শেমিজ আর ধবধবে সাদা চুলপাড় ধুতি। কপালে চামড়ার ভাঁজে সৃষ্টি লম্বা রেখাটি অত্যন্ত

স্পষ্ট। রেখাটি দুশ্চিন্তার নয়, চিন্তার। সাত বছর আগে সধবা অবস্থায় তিনি যখন পড়িতেনও কম, ভাবিতেনও কম, তখনও এই রেখাটি ছিল, তবে এত অস্পষ্ট যে, লোকে দেখিয়াও দেখিত না। তারপর বিধবা হইয়া তিনি পড়াশোনা করেন—মনস্তত্ত্ব আর দেহতত্ত্ব ছাড়া মানুষের সম্বন্ধে যত কিছু পড়িবার ও শুনিবার আছে সব। এ রকম পড়াশোনায় গভীর চিন্তাও বোধ হয় দরকার হয়। সাত বছরের চিন্তায় কপালের রেখাটি তাই স্পষ্ট আর গভীর হইয়া কপালটিকে তার দুভাগে ভাগ করিয়া ফেলিয়াছে। মাঝে মাঝে বাঁ হাতের তর্জনীর ডগা দিয়া রেখাটিকে তিনি এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘষিয়া দেন। হয়তো তোয়াজ করেন, হয়তো মিলাইয়া দিতে চান।

পরিচয় পাওয়ার পরেই অনুপমকে তিনি চিনিতে পারিলেন। বলিলেন, ওমা ! তুমি সেই অনুপম ! জলপাইগুড়িতে তোমাকে যে আমি কদিন ধরে দেখেছি, তবু চিনতে পারলাম না দেখে ? কী আশ্চর্য মন মানুষের ! তবে অনেকদিন আগে তোমায় দেখেছিলাম, দশ-এগারো বছরের কম নয়, ছোটো ছিলে তখন তুমি। কত বয়েস তোমার এখন ? উনিশ ? দশ-এগারো বছর আগে যদি তোমায় দেখে থাকি,—ধরা যাক এগারো বছর, তাহলে তখন তোমার বয়েস ছিল—

কপালের রেখায় চামড়ার ভাঁজ পড়িয়া গেল, নিজে নিজেই অবাক হইয়া সীতা বলিলেন, কী আশ্চর্য মন মানুষের ! উনিশ থেকে এগারো বাদ গেলে কত যেন থাকে ? দশ বাদ গেলে থাকে নয়, তাহলে এগারো বাদ গেলে থাকবে আট। হ্যাঁ আট। তোমার তখন আট বছর বয়েস ছিল, না ?

অনুপম বলিল, আমার ঠিক মনে নেই।

সীতা বলিলেন, আমার চেয়ে কত ছোটো তুমি, আমার মনে নেই, তোমার মনে থাকবে ? তোমরা এখন কলকাতাতেই থাক, না ? কোথায় থাক ? বড়দা এখানেই আছেন, না ?

অনুপম বলিল, বাবা আর বছর মারা গেছেন।

বীরেশ্বর আরামকেদারায় কাত হইয়া পিসি-ভাইপোর আলাপ শুনিতেছিলেন, অনুপমের কথা শুনিয়া সোজা হইয়া বসিলেন। তারপর তাঁর স্তব্ধ নিশ্চল ভাব দেখিয়া মনে হইল, সোজা হইয়া বসিবার অতিরিক্ত আর সব ক্ষমতা তাঁর শেষ হইয়া গিয়াছে।

বড়দা নেই ! বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিতে একটু সময় লাগিল সীতার। জীবনে একবার মাত্র কয়েক দিনের জন্য যে ভাইকে তিনি চোখে দেখিয়াছিলেন, সেই কয়েক দিনের মধ্যে একবারও যার কাছে ছোটো বোনের মতো ব্যবহার পান নাই, যে ধরিতে গেলে একরকম অজানা অচেনা অপরিচিত মানুষ, আর বছর সে মারা গিয়াছে এ খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেউ কি কাঁদিতে পারে ? চেয়ারে বসিয়া সীতা কাঁদিতে লাগিলেন, আর বীরেশ্বর চুপচাপ শুধু বসিয়া রহিলেন।

একুশ বছর বয়সে যে ছেলে জন্ম লইয়াছিল, আর পঁচিশ বছর বয়সে যে ছেলের সঙ্গে তাঁর হইয়াছিল বিচ্ছেদ, আজ তিয়াত্তর বছর বয়সে পাওয়া গেল তার মৃত্যুসংবাদ, সেই ছেলেরই ছেলের মুখে। পুত্রশোকের অভিজ্ঞতা বীরেশ্বরের ছিল না। তিয়াত্তর বছরের জীবনে অনেক পিতাকেই তিনি পুত্রশোক পাইতে দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু পরের শোক দেখিয়া এমন ভয়ানক ব্যাপারের অভিজ্ঞতা কি মানুষের হয় !

শঙ্কর ঘরে ছিল না। পিতামহ ও পিসিমার মুখের দিকে একবার চাহিয়া অনুপম মাথা নিচু করিয়া বসিয়া রহিল। বীরেশ্বরের স্তব্ধভাব দেখিয়া আর সীতার মৃদু কান্না শুনিয়া হঠাৎ তার মনে জ্বালা ধরিয়া গিয়াছে। আপনজন এরা ? এই প্রকাণ্ড অট্টালিকায় এত দামি আসবাবপত্রে সাজানো ঘরে বসিয়া তার বাবার মরণের খবরে এদের কাতর হইবার অধিকার কি আছে, কেবল ওই অর্গ্যানটা বেচিয়া সেই টাকায় চিকিৎসা হইলে তার বাবার যখন না মরিবার সম্ভাবনা ছিল ?

একে একে বাড়ির অন্য সকলে ঘরে আসিতে থাকে। শঙ্কর, তার মা, শঙ্করের তিনটি বোন ও ছোটো একটি ভাই, শঙ্করের এক মামা এবং এ বাড়িতে আশ্রিত ও আশ্রিতা তিনটি দূরসম্পর্কের

মানুষ। আর আসে সাত-আট বছরের একটি ছেলে। শঙ্করের বড়ো বোনটি যখন বছর খানেক আগে মারা গিয়াছিল, তার এই ছেলেটি তখন মানুষ হইতে আসিয়াছিল মামাব বাড়ি।

দুমদাম শব্দে পা ফেলিতে ফেলিতে ঘবে ঢুকিয়া ছেলেটি সকলের ভাবভঙ্গি দেখিযা থমকিযা দাঁড়াইয়া পড়িল। সীতার কান্না সকলকে যেন নির্বোধ ও নিশ্চল পুতুলে পরিণত কবিয়া দিয়াছে। কেউ জানে না ব্যাপারখানা কী, তবু সীতাব মতো মাঝবয়সি নারীর এ রকম মৃদু ও মার্জিত কান্নাব যে বড়ো রকমের একটা কারণ থাকে এটুকু তো সকলে বোঝে ! তা ছাড়া ঘরের আবহাওয়াটা যেন কেমন বিগড়াইয়া গিয়াছে। একটি অপরিচিত যুবকের উপস্থিতি, সীতার শোক আর বীরেশ্ববের স্তব্ধভাব ছাড়া আরও কী যেন একটা শোচনীয় রকমের খাপছাড়া বিষাদ ঘরেব মধ্যে সৃষ্টি কবিযা রাখিয়াছে সহজবোধ্য অস্বাভাবিকতা।

শঙ্করের স্বর্গীয়া দিদির ছেলেটি একবার চারিদিকে চোখ বুলাইয়া হাসিয়া ফেলিল। এইবকম স্বভাব ছেলেটাব, খাপছাড়া কিছু দেখিলেই সে হাসে। ছোটো বড়ো যত কিছু অসঙ্গতি আছে জগতে, সব যেন তাকে সুড়সুড়ি দেয়।

শঙ্করের মা বলিলেন, ওকি সতু, ছি !

শঙ্কর বলিল, ফের যদি হাসবি তো কান মলে লাল কবে দেব।

হুমকিতে থামিবার মতো হাসি সতু হাসে না। মামাব বাড়িতে মা মরা ছেলেকে কে মারিবে ? হুমকি যে শুধু হুমকি সে তা জানে। তাই হাসি তাব থামে না, কিন্তু তার হাসির চাপে সীতাব কান্না বন্ধ হইয়া যায় !

সতু নাগালের মধ্যেই আসিযা দাঁড়াইয়াছিল, হাত বাড়াইয়া তাকে কাছে টানিয়া অনুপম বীরেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিল, এ ছেলেটি কে ?—আর এক পা সামনে আগাইযা শঙ্কবেব মা সীতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কী হয়েছে ঠাকুরঝি ?

অনুপমের কথার জবাবে বীরেশ্বর বলিলেন, ও শঙ্কবের দিদি মাধুবীব ছেলে। আর বছব মাধুবী মারা গেছে।

শঙ্কবের মার কথাব জবাবে সীতা বলিলেন, বউদি, বড়দা আব বছব মারা গেছে।

ঘরের এতগুলি লোকের সকলের মধ্যেই কমবেশি ফাঁক ছিল, অনুপম সতুকে কাছে টানিয়া লইল, তাদের একজনের মা ও অপর জনের বাবার মৃত্যুতে এতগুলি দুঃখিত মানুষেব মধ্যে ওবা পৃথক হইয়া যাইতে চায় ; দুইজনে একসঙ্গে।

কিছুক্ষণের জন্য তাই তারা গেল। হাত ধরিয়া উপবে টানিযা অনুপমকে লইযা সতু হইযা গেল উধাও। বেশি দূরে কোথাও নয় পাশেব ঘরে,—যে ঘরে সতুকে বুকে কবিয়া সীতা ঘুমান। বুকে অবশ্য সতুকে তিনি করেন সে যখন ঘুমাইয়া পড়ে তখন, জাগিযা থাকিলে ও সব সতু ভালোবাসে না, শীতের রাত্রেও নয়। মানুষের বুক ? যার মধ্যে কী একটা আশ্চর্য যন্ত্র ঢিপঢিপ কবে আর ছোটো ছেলেকে নাগালের মধ্যে পাইলেই মানুষ যেখানে চাপিয়া ধরে প্রাণপণে, সেই মানুষের বুক ? সতু কখনও ও সব বুককে প্রশ্রয় দেয় না। তবে অনুপমের কথা ভিন্ন। আর কোনোদিন তো অনুপম তাকে বুকে পিষিবার জন্য ব্যাকুল হয় নাই।

বুকে পিষিয়া চুমা খাইয়া নাম জিজ্ঞাসা করিবার পর অনুপম বুঝিতে পারে, সতু এক অদ্ভুত রকমের অস্বাভাবিক ছেলে, নূতন টাইপের পাগলা।

নাম জিজ্ঞাসা করার জবাবে সতু বলে, নাম ? জানো সীতাও আমার সঙ্গে এমনি করে।

তা বলি নি। তোমার নাম জিজ্ঞেস করেছি।

বলছি। সীতা রোজ এমনি করে। যটা করে চুমু খেতে দেব বলেছি, দিনে সব শোধ করে নেয়। রাত্তিরে চুপিচুপি ডাকে, সতু ঘুমুলি ? আমি মটকা মেরে পড়ে থাকি, জবাব দিই না। তারপর

আমাকে জড়িয়ে ধরে খালি চুমু খায়। কী বলে জান ? বলে, আরও ছেলেবেলা তোকে যদি পেতাম সতু ! তোর মা যদি কবছর আগে মরত সতু !

সোজা স্পষ্ট অনর্গল কথা। বয়স্ক মানুষের পরিষ্কাব শুদ্ধ ভাষা, এতটুকু ছেলেমানুষির ছাপ নাই, কী যেন বুঝাইতে চায় সতু তাহাকে, তার সমবযসি অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো, আজ গ্রেটা গার্বোর ছবি দেখিতে না গেলে জীবনটা মাটি হওয়াব মতো অসঙ্গতিপূর্ণ দুর্বোধ্য একটা ব্যাপার।

অনুপম কথা বলিতে পারে না, বলার সুযোগও ঠিকমতো পায় না। সতু পালটা প্রশ্ন কবিয়া তার নাম জানিতে চায়।

অনুপম বলে, তোমার নাম আগে বলো, তবে বলব।

বললাম যে নাম ?

কখন বললে ?

ওই যে বললাম, রাত্তিরে সীতা চুপিচুপি ডাকে, সতু, ও সতু ঘুমুলি ? নাম বলব বলেই তো ও কথা বললাম। তোমার একদম বুদ্ধি নেই !

তাই মনে হয অনুপমের। মনে হয়, এই বয়সেই মনোবিকারের ফলে বুদ্ধির এমন বিকাশ ঘটিযাছে ছেলেটাব যে, তুলনায় তাব নিজের বুদ্ধি বলিয়া কিছু নাই, যা আছে সেটা শুধু বোকামি গোপন করার কায়দা।

সীতা আসিলেন। বলিলেন, তোমবা এ ঘরে বসে চুপিচুপি গল্প করছ ! কী আশ্চর্য মন মানুষের ! আমি ভাবলাম, দুজনে গেল কোথায় ? এটা আমাব শোবার ঘব, আমি আর সতু ওই খাটে শুই। আমি ছাড়া আর কাবও কাছে ও শুতে পারে না। একবার আমার জ্বর হয়েছে, ডাক্তার কাছে শুতে বারণ কবলে, ও শুলো গিয়ে তোমাব বউদিব কাছে। রাত দুপুরে চুপিচুপি উঠে এসে—

সতু দুহাতে শক্ত করিয়া অনুপমেব একটা হাত ধবিযাছিল। হাতে একটা ঝাঁকি দিযা বলিল, জানো সীতা খালি মিথ্যা কথা বলে।

সীতা তীব্র ভর্ৎসনাব সুরে বলিলেন, মিথ্যা কথা বলি ! তুই কি রে সতু, অ্যাঁ ! যা তা বলছিস আমাব নামে ? রাত দুপুরে উঠে আসিসনি সেদিন তুই ?

সতু অনুপমকে চোখেব ইশাবা করিয়া বলিল, এসেছিলাম তো।

তবে ?

সতু নির্বিকারভাবে বলিল, কী হয এলে ?

সীতা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন, মুহূর্তে নবম হইয়া গিযা নিজের মৃদু ও মার্জিত গলায় বলিলেন, তাই বল ! এক এক সময় তোব কথা শুনে গাযে যেন জ্বর আসে।

হঠাৎ অনুপমের একটা আশ্চর্য কথা মনে হয়। মনে হয়, তার সীতা পিসিমা তার পরিচিতা কোনো একটি মহিলাকে যেন নকল কবিতেছেন। কিন্তু কে যে সেই পরিচিতা মহিলা, অনুপম কিছুতেই তাহা স্মরণ করিযা উঠিতে পাবে না।

ঘণ্টা তিনেক কোনো রকমে কাটানো গেল, তারপর অনুপমের মন করিতে লাগিল কেমন কেমন। এ বাড়িতে অকারণে মানুষের মনে বড়ো কষ্ট। কোনো অভাব না থাকায় সকলের স্বভাব গিযাছে বিগড়াইয়া, জীবনে বসকষ যা আছে সব শক্ত, জমজমাট, যেমন তেমন উত্তাপে গলিয়া জীবনকে রসাল করিতে চায় না। কোন দৃষ্টিতে ইহাদের দেখিতে হইবে, বিচার করিতে হইবে, বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া অনুপম শেষ পর্যন্ত অপরিচয়ের সংকোচ কাটাইয়া উঠিতে পারে না। শঙ্করের মাকে কারও মা মনে করিতে তার রীতিমতো কষ্ট হয়। মুখে তিনি এখনও ক্রিম পাউডার মাখেন বলিয়া নয়, সাজগোজ করিয়া এখনও তিনি নিজের অপূর্ব রূপশ্রী নষ্ট করেন বলিয়া নয়, নিজের

চারিদিকে একটা গভীর বিষাদের আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া নিজের চরম স্বার্থপরতাকে তিনি পরিস্ফুট করিয়া রাখেন বলিয়া। তাঁর দৃষ্টি বিষণ্ণ, কথা বিষণ্ণ, মুখের ভাব বিষণ্ণ, বিষণ্ণতার ভারে মন্থর ও ভারাক্রান্ত তাঁহার চালচলন, ভাবভঙ্গি।

প্রথমে শোকের আবহাওয়াব মধ্যে তিনি যখন আসিয়া দাঁড়াইযাছিলেন, একমাত্র তাঁকেই অনুপমের মনে হইয়াছিল প্রকৃত শোকাতুরা, কিন্তু জিনিসটা খাঁটি মনে হইলেও বিষাদের বাড়াবাড়িতে সে একটু ক্ষুণ্ণ ও আশ্চর্য হইয়া গিযাছিল, তাবপর ধীরে ধীরে সকলের ব্যথিত ভাব কাটিয়া যাইতে লাগিল। এ-কথা সে-কথায় চাপা পড়িযা যাইতে লাগিল অনুপমের পিতাব মৃত্যুর কথা, এই সংসারের যে নিজস্ব গতিটি আছে সেই গতি কম বা বেশি সময়ের জন্য দাবি করিতে লাগিল একে আর ওকে,—আকাশপাতাল যাতায়াত কবিতে লাগিল যাবা অনুপমের আশেপাশে বহিল তাদের মুখের আলোচনা, কিন্তু শঙ্করের মার কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না। বীরেশ্বরের কথায় কযেকবার সকলে যখন হাসিয়া পর্যন্ত উঠিল, তখনও তিনি হইযা রহিলেন নিরবচ্ছিন্ন বিষাদের প্রতিমা। বাত্রির অন্ধকারে ঘরেব যে অন্ধকার কোণ মিশ খাইযা গিয়াছিল, দিনের আলোতেও সে কোণ হইয়া রহিল অন্ধকার, বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র এবং স্পষ্ট।

এ শখ অনুপমেব কেন চাপিয়াছিল বলা যায় না, একবার সে বলিয়াছিল, আপনাকে প্রণাম করা হয়নি।

বলিয়া শঙ্কবেব মাকে করিয়াছিল প্রণাম।

শঙ্কবেব মা বলিয়াছিলেন, আমাকে আবাব প্রণাম !

আর কেউ নন, তিনি কাকিমা। সে হিসাবে অনুপমের প্রণাম শুধু তাঁর প্রাপ্য নয়, গ্রহণীয। কিন্তু তার মধ্যে অনুপমের প্রণামের প্রতিক্রিযা আর তাঁর মুখের কথা শুনিয়া কে বলিবে পথেব ভিখারিনি তিনি নন, একটা পয়সাব বদলে প্রণাম পাইযা তিনি মরিয়া যান নাই মরমে !

অনুপমেব মনে হইতে লাগিল, প্রণাম সে করে নাই শঙ্কবের প্রণম্যা মাকে, মবা একটা মানুষকে খাঁড়ার ঘা দিয়াছে।

শঙ্করের মাব এই খাপছাড়া চিরস্থায়ী বিষাদ অনুপমের মন-কেমন করাকে আরও বেশি বাড়াইযা দিযাছে। তিন ঘণ্টায় তিনশোবার তাব মনে হইয়াছে পলাইযা যাওযার কথা। কিন্তু যাওয়াব কথা বীরেশ্বর কানে তুলিতে চান না, হাসিয়া উড়াইযা দেন। আর দেন খোঁচা ! এ কি পবের বাড়ি যে যাওয়ার জন্য অনুপম ব্যাকুল ?

তা নয়, কাজ আছে।

কী কাজ ? কলেজ আজ তোমার যাওয়া হবে না।

কলেজ নয, বাড়ি যাব।

সে তো আমিও যাব। বেলা পড়ুক, দুজনে মিলে যাওয়া যাবে একসঙ্গে।

আপনি আমাদের বাড়ি যাবেন ?

হঠাৎ বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করিয়াই অনুপম লজ্জা বোধ করে। তার প্রশ্নের মধ্যে বীবেশ্বরের এতকাল তাদের বাড়ি না যাওযাব ইঙ্গিতটা এমন কদর্য শোনায !

বীরেশ্বর মৃদুস্বরে বলেন, তোর বাবা আমাকে তোদের বাড়ি যেতে দিত না অনু।

এটা ঠিক কী ধরনের কৈফিয়ত ঠাহর করিতে না পারিয়া অনুপম চুপ করিয়া থাকে।

## দুই

বীরেশ্বর, শঙ্কর, অনুপম আর সতু এই চারজনে যখন অনুপমের বাড়িতে আসিয়া পৌঁছিল, রোদ পড়িয়া আসিয়াছে। শঙ্করের আসিবার ইচ্ছা ছিল না, বীরেশ্বর তাহাকে জোর করিয়া আনিয়াছেন। সতুকে কারও সঙ্গে আনিবার ইচ্ছা ছিল না, সে জোর করিয়া সঙ্গে আসিয়াছে।

রং-চটা সদর দরজা, খড়ি দিয়া নম্বর লেখা, তাও কাঁচা হাতের। বাড়ির বাহির হওয়ার সময় হইতে শঙ্কর অস্বস্তি বোধ করিতেছিল, বড়ো রাস্তায় গাড়ি রাখিয়া গলিতে প্রবেশ করার পর সে অস্বস্তি হুহু করিয়া বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। নোংরা গলি বলিয়া নয়, গরিব আত্মীয়ের বাড়ির কাছে আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া। একটি গরিব বন্ধু ছিল শঙ্করের, একদিন তাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল সেই গরিব বন্ধুটি। সে অভিজ্ঞতা শঙ্কর জীবনে ভুলিবে না। গরিব বন্ধুটি কিন্তু তার বাড়িতে আসিয়া চমৎকার মিশ খাইয়া যাইত সকলের সঙ্গে, যেটুকু মিশ খাইত না সেটুকুও আপশোশ করার মতো কিছু নয়। কিন্তু গরিবের অন্তঃপুরে শঙ্কর বিদেশি, বেমানান। কথা ও ভদ্রতার আদানপ্রদানে সেখানে নিজেও সে হোঁচট খায় বারবার, অন্যান্য সকলকেও হোঁচট খাওয়ায়। গরিব মানুষকে বড়ো ভয় করে শঙ্কর, গরিব মানুষের অন্দরমহলে সে জেলখানার কয়েদি, আধঘণ্টা সেখানে থাকিলে তার নিজেকে বাড়ির ছেলেবুড়ো সকলের ঘৃণা-মেশানো কৃপার পাত্র বলিয়া মনে হইতে থাকে।

কড়া নাড়িতে অনুপমের মা সাধনা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। দেখিবা মাত্র বীরেশ্বরকে তিনি যে চিনিতে পারিয়াছেন সেটা এমন স্পষ্ট বোঝা গেল যে, অনুপম কথা বলা দবকার মনে কবিল না। সাধনা মাথায় কাপড় তুলিয়া দিলেন, সকলের প্রবেশপথ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া একটু ভাবিলেন, তারপর একপাশে সরিয়া বলিলেন, আসুন।

বাড়ির ভিতরে ঢুকিয়া শঙ্কর একটু আশ্চর্য হইয়া গেল। মনে মনে সে কল্পনা করিযা রাখিয়াছিল, নোংরা স্যাঁতসেঁতে একটা বাড়ির, যেখানে বাতাসে মেশানো থাকে ভোঁতা দুর্গন্ধ, মানুষের মুখে থাকে ব্যর্থ লোভের ছাপ, চারিদিকে ছড়ানো থাকে ভাঙা জীবনকে জোড়াতালি দিয়া দিন কাটানোর আয়োজন। এ বাড়ির উঠান ভিজা কিন্তু স্যাঁতসেঁতে নয, এ বাড়ির বাতাসে গন্ধ শুধু রান্নার, এ বাড়ির মানুষের মুখে ছাপ শুধু অভাবের, এ বাড়িতে দিন কাটানোর আযোজন শুধু কম দামি।

তাছাড়া এত ছোটো একটা বাড়িতে এত তুচ্ছ সব আসবাব ও জিনিসপত্রগুলিকে কেহ যে এত যত্নে গুছাইয়া রাখিতে পারে, শঙ্করের সে ধারণা ছিল না। মেঝের যেখানে যে জিনিসটি থাকার কথা সেইখানে সেই জিনিসটি রাখা হইয়াছে, একচুল এদিক ওদিক নয়। জানালার জিনিস আছে জানালায়, তাকের জিনিস আছে তাকে, দেয়ালের জিনিস আছে দেয়ালে,—দেখিলেই বুঝা যায সর্বদা একটি সতর্ক দৃষ্টি এই ছোটোবড়ো স্থাবর পদার্থগুলিকে পাহারা দেয়, জানালায় পানের ডাবরের ডানদিকে রাখা কুচানো সুপারির ছোটো পিতলের বাটিটি যেন বাঁ দিকে কখনও না আসে তাই দেখিবার জন্য।

বসিতে দেওয়ার জন্য মাদুর বিছানোর সময় প্রমাণ পাওয়া গেল, এ সতর্ক দৃষ্টি কার।

রোগা লম্বা একটি মেয়ে মাদুরটা বিছাইয়া দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়ানোমাত্র সাধনা বলিলেন, অর্ধেক মাদুর যে ভাঁজ হয়ে রইল নিমি ?

ভাঁজ খুলিয়া মাদুরটা টান করিয়া পাতিয়া দিয়া নিমি সোজা হইয়া দাঁড়ানো মাত্র সাধনা আবার বলিলেন, অতগুলি দেশলায়ের কাঠি আবার ঘরে এল কোত্থেকে ? কুড়িয়ে ফেলে দিয়ে আয় বাইরে।

তিনটি পোড়া দেশলায়ের কাঠি কুড়াইয়া নিমি আবার যেই সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সাধনা আবার বলিলেন, ইনি তোর ঠাকুরদা নিমি, প্রণাম করে যা।

বলিয়া এতক্ষণ পরে নিজেও বীরেশ্বরকে প্রণাম করিলেন।

এত যত্নে মাদুর পাতা হইল, কিন্তু বীরেশ্বর ছাড়া মাদুরে কেহ বসিল না। ঘরে ছোটো একটা টুল ছিল, সেটাতে বসিয়া শঙ্কর উশখুশ করিতে লাগিল আর সতু ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল ঘরের সর্বত্র। বসানোর চেষ্টা করিয়াও তাকে বসাইতে পারা গেল না। সাধনা মৃদুস্বরে বলিলেন, বড়ো অবাধ্য ছেলে তো।

হঠাৎ রাগে শঙ্করের গা যেন জ্বলিয়া উঠিল। জোরে ধমক দিয়া বলিল, বসলি সতু ? কান মুলে ছিঁড়ে ফেলব তোর।

সাধনা বলিলেন, আহা, অমন করে ধমকাতে আছে ওইটুকু ছেলেকে ? হঠাৎ একবার ধমক দিয়ে মারধোর করলেই কি ছেলেপিলে বাধ্য হয় বাবা ? বাধ্যতা শেখাতে হয়। স্বভাব নিয়ে তো জন্মায় না ছেলেমেয়ে, চাদ্দিকে যারা থাকে তারা তার স্বভাব গড়ে তোলে।---ওমা, ধমক খেয়ে ও যে হাসছে !

বীরেশ্বর বলিলেন, হাসি ওর একটা ব্যারাম, ধমকালেও হাসে, না ধমকালেও হাসে।

এমন ছেলে তো দেখিনি কখনও !

বলিয়া সাধনা বোধ হয় ভালো করিয়া দেখিবার জন্যই সতুকে কাছে টানিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু একবার তার মুখখানার দিকে চাহিয়া সতু ছিটকাইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সাধনা মৃদুস্বরে বলিলেন, খুব দুরন্ত, নয় ?

বীরেশ্বর বলিলেন, হ্যাঁ।

বীরেশ্বরের এই জবাবে ঘরের মানুষগুলির কথা বলার সব প্রয়োজন যেন ফুরাইয়া গেল, কারও কিছু জিজ্ঞাস্য নাই, কারও কিছু জবাব দিবার নাই। এ রকম অবস্থা শঙ্কর আরও সৃষ্টি হইতে দেখিয়াছে, তার বন্ধু-পরিবারের গৃহে। কিন্তু সে সব পরিবারে তাল সামলানোর মানুষ থাকে। হয় বাড়ির গৃহিণী, নয় তার পাকাপোক্ত মেয়ে মৃদু একটু হাসে, খাপছাড়া একটা কথাকে যেখান হইতে পারে টানিয়া আনিয়া আলাপ জুড়িয়া দেয়, স্বাভাবিক স্তব্ধতার বাধাকে ডিঙাইয়া ডিঙাইয়া চলিতে থাকে সকলের কথোপকথন। কিন্তু আজ ? আজ কে এই আত্মীয়-আত্মীয়ার বৈঠকে আলাপের ভূমিকা রচনা করিবে ? আজ যখন প্রথম সংবাদ পাইয়াছেন, ধরিতে গেলে আজই বীরেশ্বরের ছেলে মরিয়া গিয়াছে,—কয়েক ঘণ্টা আগে। সেই ছেলের বিধবাবেশধারিণী বধূর সামনে বসিয়া কার পক্ষে আজ কী বলা সম্ভব ? বলার কথা অবশ্য আছে অনেক, কিন্তু সে সব কথা মানুষকে রাখিতে হয় নেপথ্যে, কারণ, হৃদয় চিরদিন নেপথ্যবাসী, হৃদয়ের কথা বাহিরে আনা ছেলেমানুষি কাজ।

সাধনা বলিলেন, আপনার শরীর বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছে, বাবা।

বীরেশ্বর বলিলেন, শরীর দুর্বল হবার বয়সে এসে পৌঁছেছি, মা। তবু যা সবল আছি তাতেই ভাবনা ধরেছে, আরও কতকাল এ পারে আটকে থাকব।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, তুমি তো আমার ঠিকানা জানতে বউমা, আমাকে একটা খবরও দিলে না ?

সাধনা নতমুখে বলিলেন, বারণ করে গিয়েছিলেন।

বীরেশ্বর মৃদুস্বরে বলিলেন, তুমি তো গোড়া থেকে সবই জান বউমা, তোমার স্বামীর কাছে আমি কোনো অপরাধ করিনি। অপরাধ যদি করে থাকি, তার মার কাছে করেছিলাম। তবু শেষ সময়েও আমায় সে ক্ষমা করে যেতে পারল না ?

সাধনা বলিলেন, তা নয় বাবা, তিনি বলে গিয়েছিলেন, সারাজীবন আপনাকে অকারণে অনেক কষ্ট দিয়েছেন, এ খবরটা গোপন রাখাই ভালো।

অকারণে ! বীরেশ্বর সোজা হইয়া বসিলেন।

তাই বলে গিয়েছিলেন। আমিও ভেবে দেখলাম এই বয়সে আপনাকে আর—

খবরটা পাবার আগেই আমি হয়তো চোখ বুজতে পারি ভেবে তুমিও চুপ করে ছিলে, না বউমা ?

মনে হয় বীরেশ্বর রাগ করিয়াছেন। এক বছর তাঁহাকে পুত্রশোকের স্বাদ হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিবার অপরাধ তিনি কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিতেছেন না। সাধনা কথা বলিলেন না। শঙ্কর শঙ্কিত দৃষ্টিতে একবার বীরেশ্বরের দিকে, একবার সাধনার দিকে চাহিতে লাগিল। অতীতের গহ্বর হইতে কীসের যেন আবির্ভাব ঘটিয়াছে এই ক্ষুদ্র ঘরখানিতে, এতকাল মানুষের হৃদয়কে যা শোষণ করিয়াছে,—কয়েকটি সম্পর্কিত মানুষের হৃদয়। অনুপম ও নিমি ঘরে ছিল, তাদের শঙ্কর দেখিতে পাইল না, ওরা অশরীরী অতীতের আড়ালে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু বীরেশ্বরের রাগ যদি হইয়া থাকে, অনুপম যখন বাড়িতে খবরটা দিয়াছিল তখন রাগ হয় নাই কেন ? অনুপমের মার উপরে রাগ করিবার কী কারণ আছে বীরেশ্বরের ?

বীরেশ্বর দাড়ি মুঠা করিয়া ধরিয়া বলিলেন, তুমি কলেজে পড়েছিলে, না বউমা ?

হ্যাঁ।

এতদিন সংসারে বাস করছ, একা এতকাল সংসার চালিয়ে এলে, সাংসারিক জ্ঞানও তো তোমার আছে ? তুমি তো বুদ্ধিমতী ?

এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন ?

করব না ? নিজের বুদ্ধি খাটাতে গিয়ে তুমি কতগুলি মানুষের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছ, ভাবতে পার ? একটা খবর পেয়ে শেষ সময়ে আমি যদি আসতে পারতাম, একদিনে পঁচিশ বছরের গন্ডগোল মিটে যেত। ছেলের শোক ? কীসের শোক আমার ? ছেলে আমার যেখানে গেছে, আজ বাদে কাল আমি সেখানে চলে যাব। তার চেয়ে আমার ভুলটা সংশোধন করার সুযোগ দিলে কি তুমি আমাকে বেশি দয়া দেখাতে না বউমা ?

সাধনা তেমনি মৃদুস্বরে বলিলেন, তা হত না বাবা।

হত না ? কেন হত না ?

সাধনা চুপ করিয়া থাকেন, শঙ্কর অসহায়ের মতো বীরেশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। এবার কী করিবেন বীরেশ্বর ? তিয়াত্তর বছরের জীবনের অভিজ্ঞতা লইয়া আজ কি বীরেশ্বর ধমক দিবেন পঁচিশ বছর যে ছেলের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক ছিল না, সেই ছেলের মাঝবয়সি স্ত্রীকে ? এ কী কলহ আজ বাধিয়া গেল এঁদের !

বীরেশ্বর আবার বলিলেন, ছেলেমানুষি কোরো না বউমা। কেন হত না স্পষ্ট করে বলো।

বলে কী হবে বাবা ? অনর্থক মনে কষ্ট পাবেন।

তুমি বুঝি ভেবেছ, মনে আমি কোনোদিন কষ্ট পাইনি, তুমি যে কষ্ট দেবে সইতে পারব না ? আমার কষ্টের কথা ছেড়ে দাও, তোমার যা বলবার আছে তাই বলো সোজা ভাষায়, আমি হাতজোড় করছি তোমার কাছে।

সাধনা মৃদুস্বরে বলিলেন, আমি হতে দিতাম না বাবা।

তুমি হতে দিতে না ?

না। হতে দিতাম না, কোনোদিন দেবও না।

বীরেশ্বর ঝিমাইয়া পড়িলেন। শঙ্কর জানালা দিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিতে পাইল, কাদের দোতলা বাড়ির উপরের ঘরের একটি আয়নায় প্রতিফলিত হইয়া শেষ বেলার রোদ এ বাড়ির ভিজা উঠানের সেইখানে আসিয়া পড়িয়াছে, যেখানে এইমাত্র নিমির সমবয়সি একটি বিধবা মেয়ে এঁটো বাসন মাজিতে বসিল।

আয়নায় প্রতিফলিত রোদ আসিয়া পড়িবার কোনো দরকার ছিল না, মেয়েটির এঁটো বাসন মাজিতে বসিবার ভঙ্গিতেই যেন ধাঁধা লাগিয়া গেল শঙ্করের। ঘরে তার ঠাকুরদাদা আর জেঠাইমার মধ্যে যে সবাক নাটকের অভিনয় চলিয়াছে, সে নাটক গড়িয়া উঠিতে সময় লাগিয়াছে এক শতাব্দীর চার ভাগের এক ভাগ, চৌবাচ্চা হইতে আর এক বালতি জল তুলিয়া এঁটো বাসন মাজিতে বসিয়া উঠানে মেয়েটি তার চেয়েও জমকালো নাটকের সূচনা করিয়া দিল এক মিনিটে। লম্বা-চওড়া অ-বাঙালি মেয়ের মতো শরীর, স্বাভাবিক রঙিন রং, পরনে অতিরিক্ত সাদা থান, এ সবের জন্য নয়, এ সব মিলিয়া জমকালো হইয়াছে শুধু মানুষটা,—নাটকীয় তার অকথ্য অবর্ণনীয় রাজবানির ভঙ্গিতে বাসন মাজিতে বসা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জয় করিয়া আর যেন কাজ খুঁজিয়া পায় নাই, তাই রাগের মাথায় বাসন মাজিতে বসিয়াছে। রাগ কমিলেই সিংহাসনে গিয়া বসিবে।

বাসন মাজা শেষ করিয়া সে কিন্তু আসিয়া বসিল শঙ্করের কাছেই, চারিটি পায়া-লাগানো এক টুকরা কাঠের তক্তায়। বসিবার জন্য অবশ্য সে আসে নাই, আসিয়াছিল ভাঁড়ার ঘরের চাবি চাহিতে, আর কিছু নয়। ঘরে অন্য মানুষ আছে কি না কে তা জানে ! কৌতূহল প্রকাশ করিয়াছিলেন বীরেশ্বর বোধ হয়, মৃত পুত্রকে লইয়া পুত্রবধূর সঙ্গে উচ্ছ্বাসের আদানপ্রদান বন্ধ করিবার জন্য।

মেয়েটি কে বউমা ?

ও ? তরঙ্গ।

তরঙ্গিনী ?

জবাব দিয়াছিল মেয়েটি নিজেই, না, শুধু তরঙ্গ।

রসিকতা জমে না, কিছুক্ষণ জমিবেও না। তবু বীরেশ্বর রসিকতার ভঙ্গিতে বলিয়াছিলেন তরঙ্গ আমাদের কে ?

সম্পর্কের কথা বলছেন ? সম্পর্ক কিছু নেই, আমি এখানে থাকি।

স্পষ্ট বলে দিলে দিদি সম্পর্ক নেই ! আমি যে তোমার দাদু ?

তরঙ্গ বলিয়াছিল, ঠাকুরদা না দাদামশায় ?

তখন সাধনা করিয়া দিয়াছিলেন পরিচয়। তরঙ্গকে বলিয়াছিলেন, ইনি আমার শ্বশুর তরঙ্গ, আর এ অনুপমের ভাই শঙ্করলাল। আর বীরেশ্বরকে বলিয়াছিলেন, রজনী ঠাকুরপোকে আপনার বোধ হয় মনে নেই বাবা, তরঙ্গ তার সেজো মেয়ে।

অতি খাপছাড়া ভাবে তরঙ্গ তখন নমস্কার করিয়াছিল দুজনকে, হাততালি দেওয়ার মতো জোরে দু-হাতের তালু সে একত্র করিয়াছিল বটে, কিন্তু সুখের বিষয় হাত দুটি তার কোমল বলিয়া আওয়াজটা জোরালো হয় নাই। তারপর সাধনার হুকুম হইয়াছিল বসিবার। সহজ, স্বাভাবিক, সুশ্রাব্য হুকুম, মিনতি করার মতো।

বসছি। সব কাজ কিন্তু পড়ে রইল জেঠিমা।

ছি, তরঙ্গ ! কতবার তোমায় বলেছি, বাড়িতে বাইরের লোক এলে মেয়েদের কোনো কাজ থাকে না, যাঁরা এলেন, তাঁদের সঙ্গে আলাপ করা, তাঁদের সুখ-সুবিধা দেখা, এই শুধু তখন মেয়েদের কাজ। এরা না হয় আত্মীয়, অন্য কেউ হলে কী রকম অস্বস্তি বোধ করতেন বল তো ? ভাবতেন যে এসে সংসারের কাজে ব্যাঘাত ঘটিয়েছেন, বেশিক্ষণ বসা চলবে না। যে বাড়িতে এসে মানুষ স্বস্তি পায় না, সেটা কি বাড়ি, না, সে বাড়িতে কাজ বলে কোনো কিছু আছে ! দরকার হলে সারাদিন অন্য কর্তব্য করে যে মেয়ে সংসারের সব কাজ করতে পারে সেই তো কাজের মেয়ে। জানালা দিয়ে দেখলাম তুমি বাসন মাজতে বসলে, তখন কিছু বলিনি ! কিন্তু আর কোনোদিন এ রকম কোরো না তরু, এত করে যা শেখাই, তা যদি ভুলে যাও, বড্ড কষ্ট হয় আমার।—কটা বাজল রে নিমি ? সাড়ে পাঁচ। ও মা, এখুনি কলে জল চলে যাবে !

খাবার জলটা তুলে রেখে আসব জেঠিমা ?

সাধনা একটু ভাবিয়া বলিলেন, না, তুমি বোসো। নিমি জল তুলতে যাক। বড়ো পিতলের কলসিটা কলতলায় নিয়ে যাস না নিমি, আনতে পারবি না। ছোটো কলসিতে কলের জল ভরে নিয়ে গিয়ে ও কলসিটা ভরিস। ঢাকনিগুলো তিনদিন ধোওয়া হয়নি, একটু সাবান দিয়ে ধুয়ে দিস। গায়ে মাখার সাবান নয় কিন্তু কাপড়কাচা সাবান। বাথরুমের খোপে দেখবি দু-টুকরো সাবান আছে, কাপড়কাচা, ছোটো টুকরোটা নিস। আর শোন—সব কথা না শুনেই চলে যাস কেন বল তো ? তোদের শিখিয়ে শিখিয়ে আর পারলাম না নিমি—একটা কথা কতবার করে শেখাব ? কী বলছিলাম ? যা, সব গোল পাকিয়ে গেল !

মৃদু একটু হাসিলেন সাধনা, হাসির সঙ্গে সখেদে বলিলেন, কী যেন হয়েছে আমার মাথাটায়, চারিদিকে আর নজর রাখতে পারি না, সংসারের কথা ভাবতে ভাবতে মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করে ওঠে।—হ্যাঁ, খাবার জল তুলে স্টোভটা ধরিয়ে আমায় ডাকিস নিমি। আবার সব কথা না শুনে চলে যায় ! তোর আজ কী হয়েছে বল তো নিমি ? স্টোভ ধরাবার সময় স্পিরিট জ্বলবার আগে দুধের কড়াটাই বসিয়ে দিস স্টোভে। কড়ায়ের ঢাকা নামিয়ে যেন আমায় ডাকতে আসিস না, বেড়ালে মুখ দেবে।

দুধ যদি ফুটে ওঠে মা ?

ফুটে উঠবে ! স্পিরিটটুকু জ্বলবে আর পাম্প করে আমায় ডাকবি, তার মধ্যে দেড় সের দুধ ফুটে উঠবে ? আজ তোকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না নিমি, তোর মাথার ঠিক নেই। তুই বোস, আমি যাই।

নিমি ব্যাকুলভাবে প্রতিবাদ করিয়া বলিল, না, না, তোমার যেতে হবে না, আমি পারব।

সাধনা দুঃখিত হইয়া বলিলেন, ছি, নিমি। আমি যা বলছি, তা কি না ভেবে না হিসেব করে বলছি ? কথা শোনো, এইখানে বোসো, এঁদের দুখানা গান শুনিয়ে দাও তোমরা দুজনে ততক্ষণ, আমি চোখের পলকে কাজ ক-টা সেরে আসছি, ও আর কতক্ষণের কাজ ? নিমি আগে গেয়ো,—বাইরে উঠেছে ঝাঁঝালো রোদ। তবু তুমি কী গাইবে ? আকাশের সীমা বাতাসের নীল, আলো দূরে, বহুদূরে ?

তরঙ্গ বলিল, আচ্ছা।

সাধনা বীরেশ্বরকে বলিলেন, আমি যাই বাবা ? ওদের গান শেষ হতে না হতে আসব।

সাধনা চাহিলেন অনুমতি, অনুমতি দেওয়ার বদলে বীরেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ওদের গান শিখিয়েছ, না বউমা ?

হ্যাঁ। নিমিকে ছেলেবেলা থেকে শিখিয়েছি, ও ভালো গাইতে পারে, কিন্তু গলাটা তেমন মিষ্টি নয় ! তবু অল্পদিন শিখছে, গানের কায়দা এখনও নিখুঁত হয়নি, তবে গলা ভারী মিষ্টি। নিমির চেয়ে ওর গান আপনাদের ভালো লাগবে, তাইতো আগে নিমিকে তারপর তরুকে গাইতে বললাম। কলের জল চলে যাবে বাবা, আমি আসছি।

কলের জল যায় এবং আসে, সময় যায় এবং থাকে। সত্যই থাকে,—সব সময়। মানুষের জীবনকাহিনি সাময়িক, কিন্তু বোকামি যাদের ব্যাধি, আবর্তন ও পরিবর্তনের ধারাবাহিকতাকে পূর্বানুবৃত্তি আর ক্রমশ ছাড়া বুঝিতে পারা তাদের পক্ষে অপরাধ। অন্তত বুদ্ধিমানেরা তাই স্থির করিয়া দিয়াছে বোকাদের জন্য। তরঙ্গ কাছে আসিয়া বসা মাত্র শঙ্করের মনে যে ভাবতরঙ্গ উঠিয়াছিল, তার মধ্যে মিশিয়াছিল অনেকখানি অস্বাভাবিকতা। কিন্তু সেটুকু বুঝিবার মতো মন তো শঙ্করের নয়, দশদিন তরঙ্গের সঙ্গে দেখাশোনা হওয়ার পর এটা ঘটিলে তবু সে বুঝিতে পারিত ভাবাবেগের এতখানি অস্বাভাবিকতার ইতিহাস আছে এবং সেই জন্য এই অস্বাভাবিকতার খানিকটা স্বাভাবিক,

কিন্তু তরঙ্গকে দেখিয়াই বিচলিত হওয়ার জন্য নিজেকে নির্লজ্জ মনে করিয়া সে বড়ো কষ্ট পাইতেছিল। একবার সতুকে পাওয়া গেল। নিমি বাহিরে ঝাঁঝালো রোদ উঠিবার গান গাহিল, তরঙ্গের গানে নীল আকাশের সীমানা পাওয়া গেল বাতাসে। তবু অপরাধের ভয়ে শঙ্করের মনে শান্তি রহিল না।

বীরেশ্বরের মনেও শান্তি ছিল না, প্রায় একই ধরনের নারী সংক্রান্ত অপরাধের অনুভূতিতে। অথচ কতদূর স্বাভাবিক ও সামাজিক ছিল তাঁর অপরাধ !—দুবার বেশি বিবাহ করা। অভিজ্ঞতার জন্য যতটুকু দরকার তার বেশি অসংযম বীরেশ্বরের জীবনে কোনোদিন আসিতে পারে নাই। পুরুষ মানুষের পক্ষে তিনবার বিবাহ করায় কী অন্যায় থাকিতে পারে এখনও তিনি তাহা ভালো করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, তবু এ বাড়িতে বহুদিন ধরিয়া সঞ্চিত অব্যক্ত ধিক্কার অনুভব করিয়া তিনি কাবু হইয়া পড়িয়াছেন। এমনিভাবে একদিন তিনি তাঁর বংশের প্রায় অজানা শাখাটির সঙ্গে পরিচিত হইতে আসিবেন, এই ক্ষুদ্র ঘরখানির মৃদু অজানা সুবাস মেশানো বাতাস নিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া কিছুক্ষণ বাঁচিতে বাধ্য হইবেন, এ কথা জানিয়াই যেন তাঁকে শাস্তি দিবার জন্য অনুপমের বাবা আর ঠাকুরমা তাঁর মনের স্থায়ী অশান্তির সঙ্গে পাপের উপলব্ধি মিশিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া গিয়াছে !

ক্ষোভে বীরেশ্বরের চোখে জল আসিতে চায়। বিপরীত অস্বাভাবিক শাসন-পীড়ন মানুষের জীবনে ? স্বামীত্যাগের অপরাধ করিল অনুপমের ঠাকুরমা, আর সমস্ত জীবন মনঃকষ্ট সহ্য করিয়াও তাঁর নিস্তার হইল না, আত্মমর্যাদাটুকু পর্যন্ত আজ হারাইতে হইবে !

সাধনার সঙ্গে চা জলখাবার আসিল। জলখাবার বিশেষ কিছু নয়, ঘিয়ে ভাজা, দুধে সিদ্ধ চিনি-মেশানো সুজি আব কয়েকখানা বিস্কুট। বীরেশ্বর এ সব কিছু খানও না, সন্ধ্যা না করিয়া কিছু খাইবেনও না। এখানে সন্ধ্যা করিয়া কিছু খাওয়া ? না, সন্ধ্যার সময় তিনি যাইবেন, আহ্নিক করিবেন অনেকক্ষণ, তাবপব কিছু না খাইয়াই শুইয়া পড়িবেন।

সন্ধ্যা আসিতে আসিতে গভীর ক্লান্তি আসিল। বীরেশ্বর উঠিলেন। সকলে একসঙ্গে নামিয়া গেল নীচের উঠানে। সেখানে বীরেশ্বর শ্রান্ত সুরে সাধনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি ও বাড়িতে যাবে না বউমা ?

কেন যাব না বাবা ?

একদিন গিয়ে সংসারটা দেখে আর মানুষগুলির সঙ্গে পরিচয় করে এসো। তারপর তোমাকে একটা অনুরোধ জানাব।

কী অনুরোধ করবেন বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার মনে হয় না সেটা সম্ভব হবে। আমার পক্ষে আপনার ওখানে গিয়ে থাকা—

বছরখানেক আগে যে মরিয়া গিয়াছে তাকে লইয়া আজ দুজনের মধ্যে যে কলহ বাধিয়াছিল, শঙ্করলালের একবার ভয় হইযাছিল বীরেশ্বর বুঝি ধমক দিয়া বসেন সাধনাকে। তখন বীরেশ্বর আত্মসংবরণ করিয়াছিলেন, এখন বিদায় নেওয়াব সময় সাধনার কথা শুনিবা মাত্র রাগে আগুন হইয়া এত জোরে তিনি ধমক দিয়া উঠিলেন যে, মনে হইল সাধনার তখনকার প্রাপ্য ধমকটাই সুদে আসলে তিনি দান করিয়া যাইতেছেন।

তোমার বুদ্ধি খুব টনটনে, সব তুমি বুঝতে পার, তা জানি বউমা। কিন্তু আমি কী বলব শুনে তারপর পাকামি কোরো, এখন থামো। তোমাদের পাকামির চোটে সংসারে মানুষের টিকে থাকা দায় হয়ে উঠেছে।

হনহন করিয়া তিনি চলিয়া যান, সাধনা ডাকিয়া বলিলেন, একটু দাঁড়ান বাবা, প্রণাম করব।

আমার বাড়িতে গিয়ে কোরো।

দড়াম করিয়া সদরের দরজা খুলিয়া বীরেশ্বর বাহির হইয়া গেলেন, পিছনে গেল শঙ্কর। গলির মোড়ে মোটরে উঠিবার সময় সেই খেয়াল করিল যে, সতুকে ফেলিয়া আসা হইয়াছে।

সতু রয়ে গেছে দাদা।

বীরেশ্বর গাড়িতে উঠিয়া বসিয়াছিলেন। বলিলেন, নিয়ে আয়। শিগগির আসিস।

সদর দরজা বন্ধ হয় নাই। ভিতরে ঢুকিয়া শঙ্কর দেখিতে পাইল, এইটুকু সময়ের মধ্যেই উনানে আঁচ পড়িয়াছে, সাধনা তরকারি কাটিতে বসিয়াছেন, নিমি আটা মাখিতেছে আর তরঙ্গ বসিয়াছে মশলা বাটিতে। তরঙ্গের গা ঘেঁষিয়া বসিয়া সতু যেন তাকে কী বলিতেছিল, শঙ্করকে দেখিয়া চুপ করিয়া গেল।

শঙ্কর বলিল, সতু আয়।

সতু বলিল, না।

এতটুকু সময়ের মধ্যে কী করিয়া যে তরঙ্গের সঙ্গে এত ভাব জমিয়া গেল সতুর ! শঙ্কর আরও দুপা আগাইয়া আসা মাত্র সে দুই হাতে গলা জড়াইয়া ধরিল তরঙ্গের।

তরঙ্গ বলিল, আপনারা যখন উপরে বসেছিলেন, চিলেকুঠিতে গিয়ে খোকা আমার সঙ্গে পরামর্শ করে এসেছে আপনাদের সঙ্গে যাবে না, এখানে থাকবে।

সাধনা বলিলেন, যেতে যখন চাইছে না, আজ থাক। কাল আমরা সঙ্গে নিয়ে যাব।

কাল আপনারা যাবেন ?

বাবা যেরকম রাগ করে গেলেন, কাল যাওয়াই ভালো। উনি বলে গিয়েছেন, বাবার মনে যেন কষ্ট না দিই। জান শঙ্কর, আমার হয়েছে বিপদ। এমন কতকগুলি উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন উনি, যার একটা রাখতে গেলে আর একটা রাখা যায় না। দোটানায় দোটানায় প্রাণ আমার বেরিয়ে গেল বাবা।

সাধনার আপশোশে নীরবতার সায় দিয়া শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, কাল কখন গাড়ি পাঠিয়ে দেব ?

সাধনা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, গাড়ি কি হবে ? বিয়্যদবার তো কাল ? অনুপম কাল দেরিতে কলেজে যাবে, ওর সঙ্গেই আমরা যেতে পারব।

তরঙ্গ বলিল, সতু আমাকে যেতে বারণ করছে জেঠিমা, বলছে নিজেও যাবে না, আমাকেও যেতে দেবে না।

হাসিমুখে সাধনাকে এ কথা বলিয়া শঙ্করের দিকে চাহিয়াই তরঙ্গ গম্ভীর হইয়া গেল।

এমনিভাবে একই বংশের দুটি শাখা কাছাকাছি আসিল, কিন্তু মিলিত হইল না। বীরেশ্বরের একটি পুত্রবধূ স্টোভ ধরাইতে হিসাব করিয়া স্পিরিটের উত্তাপটুকুর অপচয় পর্যন্ত বাঁচাইয়া চলিতে লাগিলেন এবং একটি পুত্রবধূ বিষাদের বেহিসাবি প্ররোচনায় মুখে খাবলা খাবলা মাখিতে লাগিলেন দশ বোতল স্পিরিটের দামের এক কৌটা ক্রিম। বীরেশ্বরের একটি নাতির বাজেটে এক পয়সার পান খাওয়া হইয়া রহিল বিলাসিতার খরচ এবং একটি নাতি একটার পর একটা পুড়াইয়া চলিল দশটা পানের দামের সিগারেট।

যদি বীরেশ্বরের মনে কষ্ট না দিবার আদেশটাই শুধু অনুপমের বাবা দিয়া যাইতেন, যদি বলিয়া যাইতেন যে, বীরেশ্বরের একটি পয়সা যেন তাঁর বংশের কেউ গ্রহণ না করে, তবে হয়তো সাধনা বীরেশ্বরের তর্কবিতর্ক, আদেশ, অনুরোধ ও মিনতির মধ্যে অন্তত শেষেরটাকে মানিয়া লইয়া উঠিয়া যাইতেন বীরেশ্বরের বাড়িতে, আর হাঁপ ছাড়িয়া নিশ্চিন্ত মনে এলাইয়া পড়িতেন ফ্যানের তলার নরম শোফায়। কিন্তু এই স্বতন্ত্র পরিবারটি গড়িয়া উঠিয়াছে বীরেশ্বরকে চিরদিনের জন্য বর্জনীয় করিয়া রাখিবার প্রতিজ্ঞার ভিত্তিতে, এই পরিবারের মানুষগুলির মেরুদণ্ড সোজা হইয়া আছে

চাওয়া মাত্র বীরেশ্বরের টাকার যে ভাগ পাওয়া যায় সেই টাকার লোভ জয় করিবার সাধনায়, আজ কি সে সব বাতিল করিয়া দেওয়া চলে ? শুধু মৃত স্বামীর হুকুম অমান্য করা নয়, সাধনার পক্ষে ভোলা কঠিন যে, বিবাহের পর হইতে মন্ত্র জপের মতো স্বামী তাকে শোনাইতেন, আমি যদি হঠাৎ মরে যাই সাধনা, আর তোমার টাকার দরকার হয়, বাবার কাছে হাত পাতার বদলে তুমি অসতী হয়ে যেয়ো, তোমার রূপ আছে, কলকাতা শহরে বড়োলোকও আছে অনেক। কী কুৎসিত কথা ! কিন্তু কী আবেগের সঙ্গে কথাগুলি তিনি বলিতেন ! স্বামী যে পাগলাটে ছিলেন, সাধনা তা জানেন। যে উন্মাদিনী জননীর হাতে তিনি মানুষ হইয়াছিলেন, তাতে পাগলাটে হওয়ার বদলে একেবারে যে পাগল হইয়া যান নাই তিনি, তাই আশ্চর্য !

তা ছাড়া, কী হইবে বেশি টাকা দিয়া ? এ তাদের নিজের বাড়ি, সুতরাং থাকার ভাবনা নাই। যে টাকা হাতে আছে, সে টাকা শেষ হওয়ার আগেই অনুপম টাকা আনিতে পারিবে।

প্রথমে আসা-যাওয়া একটু বেশি ছিল, তারপর গেল কমিয়া। বীরেশ্বর দু-চারদিন পরে পরেই গাড়ি লইয়া আসিতেন, খানিকক্ষণ এ বাড়িতে থাকিয়া সকলকে লইয়া যাইতেন নিজের বাড়ি। সেখানে রান্নাবান্নার আয়োজন সেদিন হইত খানিকটা উৎসবের মতো, বীরেশ্বরের সভাপতিত্বে সকলে একসঙ্গে বানাইত কথা গল্প হাসি আনন্দের সভা, মনে হইত সত্যই যেন মিলনোৎসব। কিন্তু এক তরফা যাওয়া আর আসা সাধনা কতদিন চালাইবেন ? অথচ বীরেশ্বরের বাড়ির সকলে আসিলে যে রকম খরচ করিতে হয়, ঘনঘন সে রকম খরচ করিবার ক্ষমতাও সাধনার নাই। তা ছাড়া, বীরেশ্বরের বাড়িতে দুটি পরিবারের মিলনে যত হাসি-আনন্দই সৃষ্টি হোক, বারবার এ কথা কার না মনে পড়িতে থাকে যে, এ বাড়িতে যাদের চিরদিন এ বাড়িরই লোক হইয়া বাস করিবার কথা তাহারা বেড়াইতে আসিয়াছে সাময়িক অতিথির মতো এবং তাহারা আসিয়াছে বলিয়াই এ বাড়িতে আজ এই অতিরিক্ত হাসি-আনন্দের সৃষ্টি ? এদিকে সাধনার বাড়িতে আসিয়া বীরেশ্বরের বাড়ির সকলে নড়াচড়া করিবার স্থান পায় না, বাড়িতে যেন জনতার সৃষ্টি হইয়াছে ! সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয় শঙ্করের মার। সাতাশ টাকার চেয়ে কম দামি শাড়ি পড়িয়া বাড়ির বাহির হইলে তার বিষাদের সঙ্গে মিশিয়া যায় মাথা-কাটা-যাওয়া লজ্জা অথচ সাতাশ টাকার শাড়ি যে তাকে ভ্যাংচায় এ অনুভূতিটা অন্য সব জায়গায় অস্পষ্ট থাকিলেও সাধনার বাড়িতে ঢোকা মাত্র স্পষ্ট হইয়া উঠিতে আরম্ভ করে। কিছুক্ষণ পরেই আর যেন সহ্য হইতে চায় না সাতাশ টাকার শাড়ি দিয়া নিজেকে নিজের ভ্যাংচানো।

বড়ো মাথা ধরেছে দিদি। কাপড়টা ছেড়ে ফেলি, কেমন ? মাথা ধরার সঙ্গে কাপড় ছাড়ার সম্পর্কটা বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া সাধনা তাকে নিমির একখানা শাড়ি দেন। নিমির শাড়ি পরিয়া আরও বিপদ হয় শঙ্করের মার, নিজেকে ভিখারিনি মনে করিবার যে অনুভূতিটা প্রায় সব সময়েই স্পষ্ট হইয়া থাকে তার মনে, সেটা হইয়া উঠে উগ্র এবং নিজেকে নিজের ভেংচি কাটার চেয়েও অসহ্য।

আমার শরীর কেমন করছে দিদি। আমি বরং বাড়ি চলে যাই। যাব ?

একটু শোবে ? শুয়েই থাক একটু।

কিন্তু শোবার সঙ্গে মনের বিকারের সম্পর্ক নাই। অবস্থাবিশেষে বরং কষ্ট তাতে আরও বাড়ে। শরীর ভালো নয় বলিয়া শঙ্করলালের মা শুইয়া পড়িয়াছেন শুনিয়া সকলে কমবেশি ব্যস্ত হয়, কী হইয়াছে, কেন হইয়াছে, এখন কেমন লাগিতেছে শরীর, এইসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। সাধনার বিছানায় শুইয়া শঙ্করলালের মার যেন নিশ্বাস আটকাইয়া আসে। ছি ! সকলকে এমনভাবে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছেন তিনি ! এর চেয়ে মরাও যে তাঁর ভালো ?

শঙ্করলাল এ বাড়িতে আসে একটা অদ্ভুত নিয়মে। আসে সে একা এবং পরপর তিন-চারদিন আসিয়া আট-দশদিন একেবারে আসে না। মনে হয়, পরপর তিন-চারদিন আসিলেই এ বাড়িতে আসিবার শখ তার মিটিয়া যায় এবং আট-দশদিন না আসিলে এ বাড়িতে আসিবার এমন একটা শখ তার জাগে যে, পরপর তিন-চারদিন আসিয়া সে শখটা তাকে মিটাইতে হয়। প্রথম দিন শঙ্করলালের মুখ দেখিয়া হাসিভরা মুখখানা তরঙ্গ গম্ভীর করিয়া ফেলিয়াছিল, এখন মমতাময়ী রাজরানির মতো শঙ্করলালের ছেলেমানুষি দৃষ্টিপাতকে ক্ষমা করিয়া হাসিমুখেই সে কথা বলে।

দিনকে দিন রোগা হয়ে যাচ্ছেন।

পরীক্ষা আসছে যে।

পড়ে পড়ে রোগা হচ্ছেন ? বেশ ! এ রকম রেটে রোগা হয়ে চললে পরীক্ষা পর্যন্ত টিকবেন তো ?

শ্লেষ নয়, শ্লেষ তরঙ্গ জানেও না, শ্লেষ তার মুখে মানায় না। স্নেহ করিয়াই সে কথাগুলি বলে। কিন্তু সেবার শঙ্করলালের এ বাড়িতে না আসিবার আট-দশদিনের মেয়াদটা বাড়িয়া পনেরো দিনে গিয়া দাঁড়ায়। পনেরো দিন পরে আবার যখন সে আসে, দেখা যায় সে আরও রোগা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তরঙ্গ আর তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছু বলে না। শঙ্করলালও এ বাড়িতে আসিবার মেয়াদটা সেবার বাড়াইয়া করে চারদিন।

সতু মাঝে মাঝে আসে আর দু-একদিন এ বাড়িতে থাকিয়া যায়। আসিতে সে চায় প্রত্যেক দিন এবং আসিয়া থাকিয়া যাইতে চায় চিরদিনের জন্য, কিন্তু বোজ তাকে কেউ আনেও না, দু-একদিনের বেশি এ বাড়িতে থাকিতেও দেয় না।

আসেন না শুধু শঙ্করলালের বাবা রামলাল। তিনি আদালতে ওকালতি করেন আর এখানে-ওখানে মদ খান। বাড়িতে যতক্ষণ থাকেন, নিজের ঘরে থাকেন একা। বাড়ির লোককে তিনি বিরক্ত করেন না, বাড়ির লোকও তাঁকে বিরক্ত করে না। বীরেশ্বরের সঙ্গে মাসে তাঁর যে কটি কথার আদানপ্রদান হয়, তা বোধ হয় আঙুলে গুনিয়া ফেলা যায়।

রাত দুটোর সময় বাড়ি ফিরিয়া রামলাল যদি দেখিতে পান যে শঙ্করলাল পড়িতেছে, স্থির পদে হোক, টলিতে টলিতে হোক, রামলাল তখন একবার ছেলের ঘরে যান।

বলেন, আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ো শঙ্কর।

শঙ্করলাল বিনা বাক্যব্যয়ে আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়ে।

## তিন

পরীক্ষার জন্য কে যে বেশি রাত জাগে শঙ্করলাল না অনুপম, ঠিক করিয়া বলা শক্ত। সাধ দুজনেরই সমান উগ্র, স্বপ্ন দুজনেরই সমান জটিল। শঙ্কর হইবে বিদ্বান আর অনুপম হইবে বৈজ্ঞানিক। জগতে তাদের তুলনা যদিও থাকে, অমর কীর্তি থাকিবে দুজনেরই, এত বড়ো হইবে দুজনেই যে, শ্রদ্ধায়, ভয়ে বিস্ময়ে মানুষ থ বনিয়া থাকিবে।

শঙ্করের পরীক্ষাই শেষ হইয়া গেল আগে, গরমে ও গুমোটে ভ্যাপসা একটা দিনের মাঝামাঝি। শেষ প্রশ্নের জবাবটা লিখিয়া তরঙ্গ ছাড়া এ জগতে আর কেউ নাই মনে হওয়ায় মনটা কেমন যেন তার হইয়া গেল বিভ্রান্ত। বাড়ি খালি পড়িয়া আছে জানিবামাত্র চোরের যেমন মনে হয় ভারী একটা সুযোগ পাওয়া গিয়াছে, ঠিক সেই রকম মনে হইতে লাগিল শঙ্করের। রোজ কি মানুষ এত স্পষ্টভাবে অনুভব করার সুযোগ পায় যে, তরঙ্গ ছাড়া পৃথিবীটা যখন ফাঁকা অথবা ফাঁকি, তরঙ্গকে তখন অবশ্যই পাওয়া দরকার ?

অনুপমদের বাড়ি পৌঁছিতে বেলা চারটা বাজিয়া গেল। প্রথামতো কলতলায় তরঙ্গ বাসন মাজিতে বসিয়াছিল, ছাইমাখা হাতে উঠিয়া আসিয়া কনুয়ের ঠেলায় সে খুলিয়া দিল সদরের খিল। তারপর শঙ্করের সিল্কের জামায় ছাই লাগা বাঁচানোর জন্য তাকেও ঠেলিয়া দিল কনুই দিয়াই। তাতে জামায় ছাই লাগা বাঁচিল বটে, আবেগের সঙ্গে তরঙ্গের হাত চাপিয়া ধরায় দু হাতেই কিন্তু শঙ্করের ছাই লাগিয়া গেল।

তরঙ্গ বলিল, মনে হচ্ছে আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

শঙ্করের শীর্ণ দেহ, বিবর্ণ মুখ আর উদ্‌ভ্রান্ত চাহনি দেখিলে মনে হয়, শুধু মাথা নয়, দেহের সমস্ত কলকবজাও যেন তাব খারাপ হইয়া গিয়াছে। প্রথম যেদিন প্রায় এমনই সময় অনিচ্ছার সঙ্গে সে এ বাড়িতে ঢুকিয়াছিল, সেদিনের সঙ্গে তাকে আজ মিলাইয়া না দেখিলেও সন্দেহ হয়, ইতিমধ্যে ভয়ানক একটা অসুখে সে ভুগিয়াছে। পরলোকে না গিয়া এ বাড়িতে তরঙ্গের ছাই-মাখা হাত চাপিয়া ধরিতে সে যে আসিতে পারিয়াছে, তাই পরমাশ্চর্য। তবে কথা শুনিলে আর ভাবভঙ্গি দেখিলে বোঝা যায়, পরলোকের কোনো একটি অগ্রদূত, সোজা কথায় যাদের লোকে ভূত বলে, এখনও তার ঘাড়ে চাপিয়া আছে।

তরঙ্গ ভাবিয়া-চিন্তিযা শঙ্করকে বাড়ি হইতে একেবারে তাড়াইয়া দিল। বলিল, আপনি বাড়ি যান। পরীক্ষা শেষ হযে গেল, কটা দিন এখন সময়মতো নেয়ে খেয়ে ঘুমিয়ে নিজেকে সামলে নিন গিয়ে। তখন বুঝতে পারবেন আজ কী রকম পাগলামি করছেন।

শঙ্কর ভালোবাসা জানাইতেও জানে না, কেউ ভালোবাসে কিনা বুঝিতেও জানে না। তরঙ্গের কথাও সে তাই বুঝিতে চায় না, কিছু জানিতেও চায় না। ফাঁকা উঠানে দাঁড়াইয়া এমনভাবে এমন সব কথা বলিতে থাকে যে, আসল কথাটা বুঝিলেও কথাগুলি তরঙ্গের মাথায় ঢোকে না। শেষ পরীক্ষা দিয়া সে যে আজ বাড়ি ফেরে নাই, এই গরমে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে,—এইটাই নাকি তরঙ্গকে সে যে ভীষণ ভালোবাসে, তার অকাট্য প্রমাণ।

তরঙ্গ সায় দিয়া বলে, তাই তো বলছি বাড়ি যান, বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম করুন গে।

শঙ্কর এ সব কথা শুনিতে আসে নাই, তরঙ্গের কথা সে কানেও তোলে না, নিজেব পক্ষেই ওকালতি করিয়া চলে ক্রমাগত। তরঙ্গের জন্য তার পড়ার ক্ষতি হইয়াছে, তরঙ্গের জন্য সে ভালো লিখিতে পারে নাই, তরঙ্গের জন্য সে বড়ো কষ্ট পাইয়াছে। এই সমস্ত ক্ষতির পূরণ হিসাবেই সে যেন তরঙ্গের হাত দুটিকে শক্ত করিয়া ধরিয়া আছে, কোনোদিন ছাড়িয়া দিবে না। তরঙ্গ একবাব হাত ছাড়িয়া দিবার দাবি জানায়, হয়তো শঙ্কর সেই অনুরোধ শুনিতে পায়, হয়তো পায় না, হাত একভাবেই ধরা থাকে। তরঙ্গের মুখ তাতে গম্ভীর হইয়া যায়। তাকে ভালোবাসা জানাইতে আসিয়া তাকেই শঙ্কর অবহেলা করিতেছে, একটা কথা শুনিতেছে না, কেবল এই জন্য নয়, কোনো অবস্থাতেই কারও অবহেলা তরঙ্গ সহ্য করিতে পারে না।

হাতটা ছেড়ে দিতে বলছি, শুনতে পাচ্ছেন ? গায়ে তো জোর নেই একফোঁটা, এত জোর খাটাচ্ছেন কেন ?

জোর খাটাচ্ছি ?

তা নয় ? থাকলে জোর খাটাতেন মানাত, এদিকে কাঁপছেন ঠকঠক করে, কিন্তু হাত ধরেছেন এমনভাবে যেন আমার সঙ্গে কুস্তি করবেন। চলুন তো বারান্দায় ছায়াতে যাই, শুনি আপনাব কী বলবার আছে।

তরঙ্গের ধমকে মুষ্টি শিথিল হইয়া গিয়াছিল শঙ্করের, এবার তরঙ্গই তার হাত ধরিয়া একটা জড়বস্তুকে টানিয়া লইয়া যাওয়ার মতো বারান্দায় লইয়া গেল। একটা টুল দেখাইয়া হুকুম দিল, বসুন।

হুকুম পালনে দেরি দেখিয়া শঙ্করের সিল্কের জামার জন্য যেটুকু মমতা তরঙ্গের ছিল, তাও যেন এবার উপিয়া গেল। দুই কাঁধে ছাই-মাখা হাত রাখিয়া জোর করিয়া শঙ্করকে সে বসাইয়া দিল টুলে, তারপর কলতলায় গিয়া একটা মাজা গেলাসের সঙ্গে ধুইয়া ফেলিল হাত। গেলাসে ঠান্ডা জল ভরিয়া আনিয়া বলিল, জল খেয়ে নিন, গলায় কথা আটকে যাচ্ছিল। তারপর বলুন তো এতক্ষণ কী বলছিলেন, ভালো করে গুছিয়ে বলুন।

বুঝতে পারনি ?

কেন বুঝব ? এত বয়সে একটা মেয়েকে দুটো মনের কথা জানাতে যে ছেলে হিমসিম খেয়ে যায়, তার আবোল-তাবোল কথা বুঝেও বুঝতে নেই।

শঙ্কর এবার রাগ করিয়া বলিল, তোমার মতো বয়সে যে মেয়ে এমন করে কথা বলতে পারে, তাদের ঘেন্না করতে হয়।

রাজরানির মতো যে বাসন মাজিতে পারে, এত সহজে তাকে কাবু করা যায় না। তরঙ্গ মৃদু হাসিয়া বলিল, সে আলাদা কথা।

তুমি পাগল তবু।

কে পাগল, আমি ? কীসে পাগল হলাম ? আপনার সঙ্গে সমান তালে পাগলামি করছি না বলে ?

শঙ্কর খেপিয়া যাওয়ার উপক্রম করিয়াছে দেখিয়া তরঙ্গ তাড়াতাড়ি বিনয় করিয়া বলিল, আমার কথা বাদ দিন। আপনার কথা হচ্ছিল, তাই হোক। একটা কথা শুনবেন আমার ? আজ বাড়ি চলে যান। আজ যা বলতে চাইছিলেন মাসখানেক পরে এসে বলবেন। এ কদিন সময়মতো নেয়ে খেয়ে ঘুমিয়ে সুস্থ হলেই দেখবেন, নিজেই চমৎকার বুঝতে পারবেন কত সহজ একটা ব্যাপারকে কী রকম ঘোরালো করে তুলছেন।

গ্রামোফোন বাজার মতো নির্ভুল, পরিবর্তনহীন উপদেশ। শঙ্করের মনে হয় গ্রামোফোনের হৃদয় না থাক, এমন নির্লজ্জ হওয়ার ক্ষমতা গ্রামোফোনেরও নাই।

তোমার খুব মজা লাগছে, না ?

তরঙ্গ তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়িয়া বলিল, না, দুঃখ হচ্ছে। এগ্‌জামিনের চাপে আপনার মতো ছেলে এ রকম হয়ে যেতে পারেন ভাবলে আমার বড়ো কষ্ট হয়।

নভেল পড়ে পড়ে তোমার মতো মেয়ে এ রকম বেহায়া হয়ে যেতে পারে ভাবলে আমারও কষ্ট হয়।

দুজনেরই যখন কষ্ট হচ্ছে, আপনি বাড়ি যান।

বাড়ি গিয়ে সময়মতো নেয়ে খেয়ে ঘুমোব তো ?

আকাশের দেবীকে মানুষের অপমান করার চেষ্টার মতো শঙ্করের খোঁচা দেওয়া প্রশ্ন কোনো কাজে লাগিল না, অনেক চেষ্টায় কঠিন দার্শনিক তত্ত্ব যেন শিষ্যের মাথায় ঢুকাইয়া দিতে পারিয়াছে এইরকম ভাবে খুশি হইয়া তরঙ্গ বলিল, নিশ্চয়। শরীর মন সুস্থ হলে আসবেন, আপনার সঙ্গে কথা আছে। আজকের কথা ভেবে যেন আবার পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবেন না লজ্জায়।

উঠানে নামিয়া গিয়া শঙ্কর বলিল, আর কোনোদিন তোমাদের বাড়ি আসব না।

তরঙ্গ বলিল, এটা আমার বাড়ি নয়।

গলিটা নূতনত্ব পাইয়াছে, গলির শেষে রাজপথের পারিপার্শ্বিকতায় আবির্ভাব ঘটিয়াছে অভিনবত্বের। দেওয়ালে মাথা ঠোকার চেয়ে হয়তো কিছু বেশি সময় লাগিয়াছে তরঙ্গকে প্রেম নিবেদন করিতে, ফলটা হইয়াছে একই রকম। জগৎটা গিয়াছে বদলাইয়া। জগৎ যে মানুষের মাথায় থাকে এতদিন কি শঙ্কর তা জানিত ? পথ চলিতে চলিতে শঙ্কর অনুভব করিতে লাগিল

সে হঠাৎ মহাজ্ঞানী, মহাপুরুষ হইয়া পড়িয়াছে ; কারণ পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেমন মনে হইতেছিল যে বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজনটাও শেষ হইয়া গিয়াছে, তরঙ্গের খাপছাড়া প্রত্যাখ্যানের পর এখনও ঠিক সেইরকম মনে হইতেছে এবং এটুকু বুঝিতে আর তার বাকি নাই যে, পরীক্ষার সঙ্গে জীবন শেষ হওয়ার অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য ও অর্থহীন অনুভূতিটাকেই শুধু স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে তরঙ্গ, আর কিছু নয়।

কে তরঙ্গ ? কেউ নয় ! জগৎ কী ? মস্তিষ্কের কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন। জীবন কী ? যা মনে করা যায় তাই।

অতএব কষ্ট পাওয়ার কোনো কারণ নাই। তবু অকারণে এ রকম কষ্ট সে পাইতেছে কেন ? আস্তে হাঁটার জন্য ? জোরে হাঁটে শঙ্কর, কোনো লাভ হয় না। শরীরের খানিকটা ঘাম শুধু বাহির হইয়া যায়। তৃষ্ণা পাইয়াছে বলিয়া ? পানের দোকানে ডাব খাইয়া তৃষ্ণা মেটানোর সঙ্গে একবার রোমাঞ্চ হয় শঙ্করের, জগৎ-ঠাসা মাথাটা বোঁ করিয়া ঘুরিয়া যায়, শব্দটা পর্যন্ত শঙ্কর যেন শুনিতে পায়, তরঙ্গের কাছে আমল না পাওয়ায় ভিতরে যাই ঘটুক সেটা তবু বোধগম্য ব্যাপার, এ সমস্ত কোন দেশি প্রতিক্রিয়া ? হাতে এখনও ছাই লাগিয়া আছে। খানিকটা ডাবের জলেই শঙ্কর হাত ধুইয়া ফেলিল। এও এক ধরনের বসিকতা তরঙ্গের, নিজেকে দেওয়ার বদলে খানিকটা ছাই দিয়াছে। কী শয়তান মেয়েটা, কী চমৎকার আয়ত্ত করিয়াছে মানুষ ঠকানো বিদ্যা !

বন্যার মতো তরঙ্গের শয়তানি পৃথিবী ভাসাইয়া দিয়াছে। পানওয়ালা পর্যন্ত টাকার ভাঙানিতে একটা অচল সিকি চালাইবার চেষ্টা করে, তরঙ্গের জন্য শঙ্করের যেন অচল সিকি চেনার শক্তিও লোপ পাইয়াছে। গাল দেওয়ার পর পানওয়ালার অন্যায় রাগ দেখিয়া এক চড়ও শঙ্কর তাকে মারিয়া বসে। তাতে কিছুক্ষণের জন্য একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। তা হোক, ব্যাপারটা যে অন্তত স্বাভাবিক তাই শঙ্করের ঢের। তা ছাড়া দামি জামাকাপড়-পরা ভদ্রলোক পানওয়ালাকে গাল দিয়া চড় মারিলে ব্যাপার আর কতদূর গড়াইতে পারে ? একটু হইচই হইয়াই শেষ।

যেদিকের ফুটপাতে রোদ পড়িয়াছে সেদিক দিয়াই খানিকক্ষণ হাঁটিবার পর শঙ্করের খেয়াল হয়, এতক্ষণে মনটা বেশ শান্ত হইয়াছে। ভয়ানক কিছু একটা করিবার জন্য ছটফট অবশ্য করিতেছে মনটা, তবু এতক্ষণ যেমন বিভ্রান্ত হইয়া ছিল, তার তুলনায় একেবারে জুড়াইয়া ঠান্ডা হইয়া গিয়াছে। আর ভাবনা নাই, এবার সে ধীরভাবে চারিদিক বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে পারিবে, কোনো কারণে এতটুকু উত্তেজনা জাগিবে না, অবসাদ প্রশ্রয় পাইবে না, কথায় ব্যবহারে সহজ সৌম্য ভাবটি অনায়াসে বজায় রাখিয়া চলিতে পারিবে।

এই অবস্থা ফিরিয়া পাইলে তরঙ্গ তাকে ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছিল, না ? কয়েকদিন সময়মতো নাওয়া-খাওয়া-ঘুমের বদলে মনের জোরে আধঘণ্টার মধ্যেই যদি সে নিজের এই পরিবর্তন ঘটাইতে পারে, তাতে কী বলার আছে তরঙ্গের ? যদি কিছু বলার থাকে বক্তব্যটা শুনিয়া আসিতেই বা দোষ কি ? এ সব ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়া ভালো। কোন কথার জবাবে তরঙ্গ কী বলিয়াছিল, কী কথা বলিবার ভঙ্গিতে তরঙ্গ কী ইঙ্গিত করিয়াছিল, এ সব কিছু কি সে লক্ষ করিয়াছে ? আগাগোড়া হয়তো ভুল বুঝিয়া আসিয়াছে তরঙ্গকে। হয়তো খেলা করিতেছিল তরঙ্গ। এই গরমে বাসন মাজা কাজটা তো মধুর নয়, সেই কাজের মাঝখানে তাকে পাইয়া হয়তো একটু মাধুর্য সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছিল,—এখন মনে মনে বুক চাপড়াইয়া আপশোশ করিতেছে। বড়ো বড়ো চোখ দুটি জলে ভরিয়া গিয়া টপটপ করিয়া ছাই-মাখা বাসনে ঝরিয়া পড়িতেছে তার চোখের জল। মেয়েদের কথার আড়ালে যে সব কথা থাকে তার একটাও যে লোকটা ধরিতে পারে না, তার বোকামির কথা ভাবিতে ভাবিতে বিস্ময়ের হয়তো অন্ত থাকিতেছে না তরঙ্গের। 'আজকের কথা ভেবে লজ্জায় যেন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবেন না' এই অনুরোধের আসল মানে সে বুঝিতে পারিবে

কি না ভাবিয়া দুর্ভাবনায় বুক হয়তো দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে তরঙ্গের, আরও স্পষ্টভাবে কথাটা তাকে বুঝাইয়া না দেওয়ার জন্য মাথা খুঁড়িয়া মরিয়া যাওয়ার ইচ্ছা হইতেছে।

বুক যে আবার টিপটিপ করিতেছে, সে জ্ঞান শঙ্করের রহিল না, গালে চড়-মারা পানওয়ালার দোকানের সম্মুখ দিয়া ফিরিয়া যাওয়ার সময় সেই দোকান হইতেই এক প্যাকেট সিগারেট সে কিনিয়া লইল, পানওয়ালা যে এতক্ষণে তার পাগলামির হদিস পাইয়াছে, সেটুকু বুঝিতে পারিয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইল না, জোরে হাঁটিয়া ঘামিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া ভাড়া করিল একটা রিকশা।

এবার দরজা খুলিল অনুপম। কোন চুলায় সে গিয়াছিল কে জানে, এইটুকু সময়ের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছে। তরঙ্গকে আর একা পাওয়ার উপায় নাই। তরঙ্গ বাসন মাজা শেষ করিয়া কলসিতে জল ভরিতেছিল, শঙ্করকে দেখিয়া কিছু বলিল না।

অনুপম সলজ্জ বিব্রতভাবে বলিল, তোমার সঙ্গে তো কথা বলতে পারব না ভাই, কাল আমার ফিজিক্স হবে। একদিনে দু পেপার।

একটু হাসে অনুপম। হাত কচলায়। রাত কি সেও কম জাগিয়াছে।

শঙ্কর বলিল, না না, তুমি পড়োগে যাও।

পড়ার ঘরে গিয়া অনুপম খিল দেয় বটে, তরঙ্গকে কিন্তু একা পাওয়া যায় না। উপর হইতে নামিয়া আসেন সাধনা, নীচের তলার একটা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসে নিমি। সাধনা শঙ্করকে বসিতে বলেন, নিমি আবদার করিয়া বলে, স্টোভটা ধরিয়ে দেবেন শঙ্করদা ?

তাতে অসন্তুষ্ট হইয়া সাধনা বলেন, ও রকম প্যানপ্যান করে কথা বলিস না নিমি, বিচ্ছিরি শোনায়। তুই ধরাতে পারিস না স্টোভ ? শঙ্করকে কেন ?

শঙ্করদা ভালো পারেন।

সাধনা এ কথায় আরও অসন্তুষ্ট হইয়া বলেন, শঙ্করদা বলতে না তোকে বারণ করেছি নিমি ? তাও এমন করে বলিস যেন ওর নামটা নিয়ে তামাশা করছিস। অনুর চেয়ে শঙ্কর বড়ো, ওকে বড়দা বলিস।

এদিকে কলসি ভরিয়া যায় তরঙ্গের, কিন্তু চোখে জল কই তার, যে জল টপটপ করিয়া মাজা বাসনে পড়া উচিত ছিল ? চোঁখ পর্যন্ত ছলছল নয়, মুখ পর্যন্ত ম্লান নয়। তাকে দেখিয়া একটু চাপা হাসিও যদি তরঙ্গ হাসিত ! একটু আড়চোখেও অন্তত যদি সে চাহিত বারেকের জন্য !

জলের কলসি তুলিয়া রাখিয়া তরঙ্গ কী কাজে যেন উপবে গেল, সাধনা কী একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু প্রশ্নটা কানে না তুলিয়া গোঁয়ারের মতো শঙ্করও তার পিছু পিছু দোতলায় উঠিয়া গিয়া বোকার মতো জিজ্ঞাসা করিল, রাগ করেছ নাকি ?

তরঙ্গ বলিল, আপনাকে না বাড়ি যেতে বলেছিলাম ?

শঙ্কর আত্মপ্রতিষ্ঠ ভাবের অভিনয় করিয়া সহজভাবে বলিল, তা বলেছিলে।

কেন তবে আমাকে জ্বালাতন করছেন ?

জ্বালাতন করছি ?

এত করে বোঝানোর পরও তা মাথায় ঢোকেনি ? আপনি কি হাবা ? এত সোজা একটা কথা, তাও কি মাথায় লাঠি মেরে না বোঝালে বুঝতে পারেন না ? কেন যে আপনারা পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্মান ! জানেন, আপনাদের জন্যে দেশটা রসাতলে গেল।

আরও অনেক কথা। তরঙ্গ যে বক্তৃতাও দিতে জানে, মেয়ে হইয়াও সে যে মেয়ে নয়, সে আজ মরিয়া গেলেও যে তরঙ্গ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিবে না, এই ধরনের অনেকগুলি সত্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে আবিষ্কার করিয়া শঙ্কর আবার নামিয়া আসিল পথে। মাথার জগৎটা এবার বাহিরে আসিয়াছে, ছোটো ছোটো চৌকা ঘর-কাটা ফুটপাতে পানের পিক, নোংরা জল, ছেঁড়া কাগজ, ছেঁড়া

পাতা, কুকুর, মানুষ, গোরু, ঘোড়া, গাড়ি, বাড়িঘর, আকাশ, যেখানে যা কিছু আছে সমস্তের মধ্যে, কারণ জগৎটা তাই,—মাথার ফাঁকির খেলার মধ্যেও বাহিরে সবকিছু থাকার রহস্য। শঙ্করের কি আর বুঝিতে বাকি আছে, বাস্তবতা কাকে বলে ? তরঙ্গ ঠিক বলিয়াছে, মানুষ হইয়া যে একজন দুজন মানুষের জন্য কাঁদে, সে অমানুষ। কাঁদিতে যদি হয় তো বৃহত্তর কোনো কিছুর জন্য কাঁদা উচিত, সে কান্নাই প্রকৃত প্রেমের লক্ষণ, আর সব ন্যাকামি। আরও যেন কী সব বলিয়াছে তরঙ্গ। বড়ো বড়ো চোখ দুটি আরও বড়ো বড়ো করিয়া তরঙ্গ যত বড়ো বড়ো কথা বলিয়াছিল, ইতিমধ্যে প্রায় তার সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছে দেখিয়া শঙ্কর আশ্চর্য হইয়া যায়। এত বই পড়িয়া এত কথা এতকাল ধরিয়া মনে রাখিতে পারিয়াছে, শুধু তরঙ্গের কথাগুলি দশ মিনিটের মধ্যে ভুলিয়া গেল ? সে যে অপদার্থ তাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু কে অপদার্থ নয় ? দৃষ্টিতে যেন তার নূতন একটা রশ্মি সঞ্চারিত হইয়াছে, মানুষের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া একেবারে ভিতরটা খানাতল্লাশ করিবার শক্তি জন্মিয়াছে,—এমনকী একশো দেড়শো গজ দূরে দাঁড়াইয়া যে লোকটা চুরুট টানিতে টানিতে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তার ভিতরটা পর্যন্ত শঙ্করের দৃষ্টির আলোতে সুস্পষ্ট। লোকটার কাছাকাছি যাইতে যাইতে ট্রাম আসিয়া পড়িল, শঙ্করও উঠিয়া পড়িল ট্রামে। ট্রামের দেশি আর বিদেশি নরনারীগুলিও সব অপদার্থ। কারও মুখে মনুষ্যত্বের ছাপ নাই, বৃহত্তর মহত্তর কিছুর জন্য কাঁদা দূরে থাক, দু-একজন মানুষের জন্য পর্যন্ত তারা কেউ কাঁদিতে রাজি কিনা সন্দেহ, ট্রামের টিকিট কেনার পয়সা খরচ করার দুঃখ সহ্য করিতেই যেন সকলের প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে। এখন বাড়ি ফিরিবার ইচ্ছা শঙ্করের ছিল না। তবু বাড়ি ফিরিতে হইলে একটা পার্কের যে কোণে নামিয়া তাকে বাসে উঠিতে হইবে, সেইখানে সে নামিয়া পড়িল। পার্কে একটা সভা হইতেছে, সভায় না ঢুকিয়াই বোঝা যায় দেশের নামে দেশের লোকের সভা, কারণ, সমগ্রভাবে সভার চেহারাটা কুড়ানো আবর্জনার স্তূপের মতো,—হুজুগের ঝাঁটা অকেজো, ফেলনা কতকগুলি মানুষকে একত্র করিয়াছে। তরঙ্গের সঙ্গে সমস্ত জগৎ তাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, ভিতরে এই রকম একটা অনুভূতির প্রাবল্য থাকায় ভাঙাবাড়ির পুরানো ইট পাটকেলের স্তূপের মতো এতগুলি মানুষের ভিড়ের জন্য শঙ্কর একটু আকর্ষণ বোধ করিল। পার্কে ঢুকিয়া সে মিশিয়া গেল ভিড়ে। লোক বড়ো কম জমে নাই, হাজার তিনেক হইবে বোধ হয়। বাহির হইতে সভার যে বৈশিষ্ট্য শঙ্করের চোখে পড়িয়াছিল, ভিতরে ঢুকিয়া সে দেখিল আশেপাশে যে কজনের মুখ ভালো করিয়া দেখা যায়, তাদের প্রত্যেকের মুখে সেই বৈশিষ্ট্যেরই ব্যক্তিগত ছাপ। বেশ বোঝা যায়, কেউ আপিস হইতে ফেরার পথে বিনামূল্যে একটু বৈচিত্র্য সংগ্রহ করিতেছে, কেউ উদ্দেশ্যহীন ঘুরিয়া বেড়ানো স্থগিত রাখিয়া ভিড়ে মিশিয়াছে, কেউ নিদারুণ আত্মগ্লানিকে একটু ফাঁকি দিবার আশায় দেশের জন্য আহূত সভায় যোগ দেওয়ার মতো মহৎ কাজের আত্মপ্রসাদটুকু লাভ করিতে আসিয়াছে, কেউ আসিয়াছে এইভাবে সভায় সভায় উচ্ছ্বাসের রোমাঞ্চ ও শিহরন পাওয়ার নেশা মিটাইতে ! ডাইনের বুড়ো মানুষটি ক্রমাগত মাথা নাড়িয়া যাইতেছেন, মুদ্রাদোষের জন্য অথবা বক্তৃতায় সায় দিবার জন্য বোঝা যায় না। বাঁদিকের প্রৌঢ় লোকটি বোবা-হাবার মতো প্রায় হাঁ করিয়া চাহিয়া আছেন বক্তৃতামঞ্চের দিকে, মনে হয়, বক্তৃতার যে কথাগুলি তার কানে ঢুকিয়াছে, তার মানে বুঝিবার চেষ্টা করিতে করিতে বক্তার এখনকার কথাগুলি কানে ঢুকাইয়া চলিয়াছেন। সামনের যুবকটি বোধ হয় যৌবনচর্চার ফলেই নিজের দেহে বাস করিবার অধিকার হারাইয়া ফেলায় ছটফট করিতেছে, কিন্তু দেশে বাস করার অধিকারটুকু বজায় রাখার জন্য সভা ছাড়িয়া চলিয়াও যাইতে পারিতেছে না।

চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া মানুষগুলিকেই শঙ্করের দেখিতে ইচ্ছা হইতেছিল। বক্তৃতামঞ্চের দিকে জোর করিয়া চোখ রাখিয়া সে বক্তার কথাগুলি শুনিবার চেষ্টা করিল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে

হইল, সে যেন তরঙ্গের কথা শুনিতেছে। তরঙ্গই যেন পুরুষ সাজিয়া গলা মোটা করিয়া মঞ্চে দাঁড়াইয়া চিৎকার করিয়া বলিতেছে, আর সমস্ত কান্না ন্যাকামি, দেশের জন্য, দশের জন্য যে কান্না সেই কান্নাই আসল কান্না।

একেবারে বক্তৃতামঞ্চে গিয়া চড়াও হওয়ার খেয়ালটা শঙ্করের চাপিল দু নম্বর বক্তাকে দেখিয়া। ভদ্রলোক শঙ্করের চেনা। তবে তিনি যে একা তারই চেনা নন, আরও অনেকেই যে তাঁকে চেনে, সেটা বোঝা গেল তিনি উঠিয়া দাঁড়ানো মাত্র সভায় মৃদু একটা জয়ধ্বনি উঠায়। ব্যাপারটা বড়ো আশ্চর্য মনে হইল শঙ্করের। বছরখানেক আগেও যিনি ফাঁকি দিয়া—সাধারণ জুয়াচুরির চেয়েও খারাপ আইনসঙ্গত জুয়াচুরি করিয়া—বীরেশ্বরের হাজার তিনেক টাকা মারিয়া দিয়াছিলেন, তাকে দেখিয়া জনতার উল্লাস ? কাগজে সম্প্রতি একজন লীলাময় ঘোষের নাম দেখা যাইতেছিল বটে মাঝে মাঝে, তিনিই কি ইনি ? পাশবালিশের মতো গোলগাল লীলাময়ের এ তো এক অপরূপ লীলা !

মঞ্চে উঠিবার অধিকার শঙ্করের ছিল না, কিন্তু রাজসিংহাসনে উঠিবার অধিকারও শুধু অপেক্ষা রাখে অর্জুনের। বাধা মানিবার মতো মন তার ছিল না, বাধা সে ঠেলিয়া সরাইয়া দিল দু হাতে, গম্ভীর মুখে একটু মাথা হেলাইয়া সমস্ত প্রতিবাদে সায় দিয়া বসিয়া পড়িল লীলাময় ঘোষেরই খালি চেয়ারটিতে। উদাস মধুর সজল কান্নার সুরে লীলাময় তখন বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। সুর যেমনই হোক থাকিয়া থাকিয়া এমন সব বিশ্রী হাসির কথা তিনি বলিতে লাগিলেন যে, সভায় চাপা হাসির গুঞ্জন উঠিতে লাগিল। বক্তৃতার এ একটা টেকনিক,—'কাঁদো'-'কাঁদো' গোপাল ভাঁড় মানুষকে মুগ্ধ করে বেশি।

একবার হাসিটা হইল প্রবল, মিনিটখানেক গোলমাল থামিল না। সেই অবসরে লীলাময় জিজ্ঞাসা করিলেন, কী খবর শঙ্কর ?

আমি কিছু বলব।

বলবে ? আমাকে না সভায় ?

সভায়।

কী সর্বনাশ ! ও সব দুর্বুদ্ধি কোরো না।

লীলাময়ের বক্তৃতা শেষ হওয়ার মাত্র শঙ্কর বিনা ভূমিকায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রাণপণে চিৎকার করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, বন্ধুগণ, অনাহূতভাবে আমি আপনাদের একটা সুপরামর্শ দিচ্ছি, আপনারা ন্যাকামি ছাড়ুন। আপনারা সকলেই ন্যাকা। কেন জানেন ? আপনারা সকলে একের জন্য, দুয়ের জন্য, তিনের জন্য কাঁদেন, দশের জন্য কাঁদেন না। আপনারা অমানুষ, পশু, অসভ্য, বর্বর। আপনাদের লজ্জা করছে না এখানে বসে থাকতে ? ঘরের কোণের একজন দুজন তিনজনের জন্য নিজেকে আপনারা উৎসর্গ করে দিয়েছেন জানোয়ারের মতো, এই সভায় এসে ভিড় করবার কী অধিকার আপনাদের আছে ? আমি যদি বলি আপনাদের মাঝখানে এখন একটা বোমা ছুঁড়ে মারব, আপনারা যে যার প্রাণ নিয়ে পালাবার জন্য পাগল হয়ে উঠবেন, বড়ো জোর সঙ্গে নেবার চেষ্টা করবে একজন দুজন কি তিনজনকে, অথচ এমন জমাট বেঁধে আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন, এমন গলাগলি মাখামাখি ভাব আপনাদের,—থামানোর চেষ্টা, টানিয়া বসানোর চেষ্টা, স্বয়ং সভাপতির উঠিয়া দাঁড়াইয়া শ্রোতাদের ব্যাপারটা বুঝানোর চেষ্টা সব ব্যর্থ হইয়া গেল। চার-পাঁচজন স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া যখন একসঙ্গে শঙ্করকে চাপিয়া ধরিল, সে গলা ফাটাইয়া শ্রোতাদের জিজ্ঞাসা করিল,—এঁরা আমায় বসিয়ে দিচ্ছেন, আপনারা আমার কথা শুনবেন না ?

গালাগালি-মুগ্ধ শ্রোতারা বলিল :

শুনব ! শুনব !

বেশ তো বলছিল বাপু, বলুক না।

এই ভলান্টিয়ার শালারা, ছেড়ে দে পাগলাটাকে।

বন্দেমাতরম্ !

আস্তে ! আস্তে ! বড়ো গোল হচ্ছে !

পাগলাটার নাম কী ?

বার করে দাও পাগলাটাকে—মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দাও।

কী বলছিল, বলুক না শুনি।

চার-পাঁচজন নেতার হাতগুলি মিনিট পাঁচেক শূন্যে আন্দোলিত হওয়ার পর গোলমাল একটু কমিল। তারপর লীলাময় উঠিয়া বুকের কাছে দুটি হাত একত্র করিয়া ধীরে ধীরে নিজেকে কেন্দ্র করিয়া বার সাতেক চারিদিকে পাক খাওয়ার পর গোলমাল থামিয়া গেল। তখন সভাপতি ধীরে ধীরে নিবেদন করিলেন যে, সকলে গোলমাল করিলে তো সভার কাজ হয় না, অতএব সকলে অনুগ্রহ করিয়া তাঁর সবিনয় নিবেদন মন দিয়া শেষ পর্যন্ত শুনুন। এই যে এই লোকটি বলা নাই, কওয়া নাই বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইনি কে কেউ তা জানে না, এ সভায় এঁর বক্তৃতা দিবার কোনো কথা ছিল না, তা ছাড়া এ সভা যে জন্য আহ্বান করা হইয়াছে তার সঙ্গে এ ভদ্রলোকের বক্তব্যের কোনো সম্পর্ক নাই, আর এ ভাবে যার যখন খুশি যা ইচ্ছা তাই বলিয়া গেলে কোনো সভার কাজ হয় না, তবু সভার সকলে যদি এই ভদ্রলোকের কথা শুনিতে চান, সভাপতি হিসাবে তিনি সকলের ইচ্ছার মর্যাদা রাখিয়া এঁকে বক্তৃতা প্রদানের অনুমতি দিবেন, মুখে কিছু না বলিয়া যাঁরা এঁর বক্তৃতা শুনিতে চান যদি দয়া করিয়া হাত তোলেন—

হাত উঠিল অনেকগুলি এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে শঙ্কর সভায় বলিবার অনুমতি পাইল। এবার কিন্তু সে না পাইল কথা খুঁজিয়া, না পারিল উদ্ধত উন্মাদনার সঙ্গে গগনভেদী চিৎকার করিতে। প্রত্যেকটা শব্দ যেন গলায় আটকাইয়া যাইতে লাগিল। একবার ভাবিল, উপস্থিত সকলকে আরেকবার জানোয়ার বলিয়া গাল দেয়, অন্তত অমানুষ বলে। কিন্তু হিসাব করিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া এতগুলি মানুষকে ও সব কথা বলিবার সাহস সে কোথায় পাইবে ? ভদ্রভাবে নিচু গলায় জড়াইয়া জড়াইয়া কয়েক মিনিট কী যে সে বলিল, সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। তারপর আচমকা বক্তৃতা থামাইয়া বসিয়া পড়িল। দুই কানে তখন তার আগুন ধরিয়া গিয়াছে, মনে জাগিয়াছে সীতাদেবীর সেই সাধ, যে সাধের মর্যাদা রাখিতে প্রকাশ্য সভাভূমিতেই ধরিত্রী দ্বিধা হইয়া গিয়াছিলেন।

এক সময় সভার কাজ শেষ হইয়া গেল। লীলাময় ডাকিতেই সে কলের পুতুলের মতো তার পিছু পিছু দাড়িওয়ালা এক ভদ্রলোকের প্রকাণ্ড গাড়িতে গিয়া উঠিল। লীলাময় জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ব্যাপার কিছু বুঝলাম না বাপু, এ রকম কেলেঙ্কারি করলে কেন ?

শঙ্কর বোকার মতো বলিল, কী জানি।

দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন, তা ঠিক, জানলে কি আর করতে ?

লীলাময় পরিচয় করিয়া দিলেন। দাড়িওয়ালা ভদ্রলোকের নাম কেদারনাথ রায়, মফস্বলে কিছু জমিদারি আছে, কলিকাতায় কয়েকখানি বাড়ি আছে।

কাগজে মাঝে মাঝে নাম দেখ না শঙ্কর ? দেখবে কী, খবরের কাগজ কি আর পড় ! হাতের কাছে যদি একখানা কাগজ পেলে তো নারীহরণ, সিনেমা আর খেলাধুলা সংবাদ পড়েই খতম। বেশ নাম হচ্ছে কেদারবাবুর, আর বছরখানেক বছর দুই যাক, লোকের মুখে মুখে ওঁর নাম ঘুরবে। নেতা হওয়া কি সহজ ? কত হিসাব করে কত ভেবেচিন্তে প্রত্যেকটি পা ফেলতে হয়। তোমার মতো বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ সভায় এসে গলাবাজি করলেই কি হয় ! আজ তিন বছর ধরে কেদারবাবু কত চেষ্টা করেছেন, তবে আজ মিটিং-এ একটু খাতির পান।

আজ তো উনি কিছু বললেন না ?

বললেন বইকী, সকলের আগে উনি বলেছেন, ওঁকে আগে বলতে দিতে একটু আপত্তি হয়েছিল, হিংসুটে লোকের তো অভাব নেই, সভার রিপোর্টে কাগজে আগে ওঁর নামটা বেরুবে, তাতেও লোকের গা জ্বলে। আমি কিন্তু ছাড়বার ছেলে নই বাবা, স্পষ্ট বলে দিলাম প্রথমে বলতে না দিলে উনি যে একশো টাকা চাঁদার কথা বলেছেন সেটা ক্যানসেল হয়ে যাবে। শুনে সবাই চুপ।

কেদারনাথ একটু অস্বস্তির সঙ্গে বলিলেন,—একশো !

শঙ্কর দেখিতে পাইল কেদারের উরুতে আঙুলের খোঁচা দিয়া লীলাময় কী যেন ইঙ্গিত করিলেন, কেদার আর কথা বলিলেন না।

লীলাময় খুশি হইয়া শঙ্করকে বলিলেন, কিন্তু তোমার কাণ্ড দেখে আমি কিন্তু থ বনে গেছি ভাই। ইচ্ছাটা কী বল তো ? এই বয়সে বড়ো হওয়ার শখ চেপেছে না কি ?

শঙ্কর ঝিমাইয়া পড়িয়াছিল, তবু গায়ের জোরে উদ্ধতভাব বজায় রাখিয়া বলিল, বড়ো হওয়ার শখ কোন বয়সে থাকে না ?

কিন্তু ও ভাবে কি বড়ো হওয়া যায় বে দাদা ! তার ধরাবাঁধা মেথড আছে। এই যে এত কাণ্ড করলে, তুমি ভাবছ কাল কাগজে কাগজে তোমার নাম বেরিয়ে যাবে ? সে গুড়ে বালি।—এক লাইন শুধু লিখে দেবে, একজন পাগলাটে ইয়ংম্যান মিটিংয়ে গোলমাল করেছিল। তোমার নামটি পর্যন্ত করবে না।—কী করছ তুমি এখন ?

কিছু না।

এ লাইনে আসবে ?

বলিয়া শঙ্করেব জবাবের জন্য অপেক্ষা না কবিযাই খুশিতে উচ্ছ্বসিত হইযা উঠিলেন, শঙ্করের হাত নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ করিয়া বলিলেন, বেশ, কিছু ভেবো না তুমি, আমার উপব সব ভার ছেড়ে দাও, আমি সব ঠিক করে দেব। কিন্তু সে তো দু-একদিনের ব্যাপাব নয়, দু-এক কথাতে সব ঠিক হয়ে যাবে না। এক কাজ করো তুমি, কাল দুপুরবেলা একবার এসো আমার বাড়িতে—কথাবার্তা কওয়া যাবে। হ্যাঁ কেদারদা, এই সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে যাব ? কোথাও একটু কিছু—একজন ইয়ংম্যান সঙ্গে রয়েছে, আজ বেশ জমত। অ্যাঁ ?

কেদার বলিলেন, কনকের ওখানে—?

শঙ্কর আবার দেখিতে পাইল, কেদারের উরুতে আঙুলের একটা খোঁচা দিয়া লীলাময আবার কী যেন ইঙ্গিত করিলেন, কেদার আর কথা বলিলেন না। একটা অদ্ভুত অবর্ণনীয় অনুভূতি শঙ্করের ভিতরে ম্যাজিকওয়ালার চারাগাছের মতো গজাইয়া উঠিতেছিল। জীবনে যেন হঠাৎ একটা বহস্যময় অ্যাডভেঞ্চার শুরু হইয়া গিয়াছে। কনক যে কে এবং কেন যে সে বাতিল হইয়া গেল বুঝিতে শঙ্করের বিশেষ কষ্ট হইল না। ছেলে সে কেমন, কনক নামধেয়ার স্ফূর্তির বাজারে সওদা কিনিতে যাওয়াটা সে কীভাবে গ্রহণ করিবে, এখনও লীলাময় তার হদিস পান নাই। চালাক-চতুর মানুষ, হিসাব না করিয়া এক পা চলেন না, কনককে তাই এখনকার মতো আড়ালেই রাখিযা দিলেন।

চৌরঙ্গির এক হোটেলে গিয়া সামনে ধরিলেন শুধু একটা পেগ। শুকনো নীরস জীবন মানুষের, কঠিন বাস্তবতার ধুধু প্রান্তর পার হইয়া চলিতে হয় মানুষকে—হয় না ভাই শঙ্কর ? বিষ—জীবনে শুধু বিষ। মাঝে মাঝে তাই একটু অমৃত চাই মানুষের—চাই না ভাই শঙ্কর ?

শঙ্কর সায় দিয়া বলিল, নিশ্চয়।

বলিয়া এক চুমুকে গ্লাসটা শেষ করিয়া নিজের হাতে নিজের গলা চাপিয়া ধরিয়া শঙ্করের মুখ বাঁকানোর রকম দেখিয়া লীলাময় ও কেদার দুজনেই হাসিলেন। কিন্তু গ্লাসে চুমুক সে যে দিয়াছে, দলে সে যে ভিড়িয়াছে, ইহাতে পরম স্বস্তিও দুজনে যে পাইয়াছেন, সেটা বেশ বোঝা গেল।

কেদার বলিলেন, আনাড়ি।

লীলাময় রসিকতা করিয়া বলিলেন, নাড়িজ্ঞান পাবে কোথায় দাদা, নাড়ি কি কখনও ধরেছ !

নাড়িজ্ঞানী কেহ তখন শঙ্কবের নাড়ি ধরিলে ভয়ে ভয়ে তাকে তৎক্ষণাৎ বাড়ি পাঠাইয়া দিতেন। ভিতরের জ্বালাটা কীসের বুঝিতে না পারিয়া শঙ্কর একটু চিন্তিত হইযা পড়িয়াছিল। মাথাটাও ঝিমঝিম করিতেছে। বিনা আয়োজনে, বিনা প্রয়োজনে আজ সন্ধ্যায় সে এ কী চমৎকার নবজীবন আরম্ভ কবিয়া দিল ! মিটিংয়ের লীলাময়েব মুখোশ এখনও খসে নাই, উপর হইতে একটা পর্দা সরিয়া গিয়াছে মাত্র। এখনও লীলাময়ের মুখ দেখিলে মনে হয়, রসে টইটুম্বুর একটা মানুষ কান্নার ভানকবা রসিকতায় ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে। কেদার কী বক্তৃতা দিয়াছিলেন শঙ্কর শোনে নাই, লীলাময়েব কথাগুলি তাব মনে আছে। এখন যে সুবাস বাসা বাঁধিয়াছে লীলাময়েব মুখে, মিটিংয়ের কথাগুলিব সঙ্গে সেটা মিশিযা থাকিলে না জানি আরও কত শ্রুতিমধুর হইত তার বক্তৃতা, আরও কত মুগ্ধ হইয়া যাইত সভার লোক ! ভাবিতে ভাবিতে শঙ্কর হঠাৎ হাসিয়া ফেলিল।

লীলাময় গদগদ হইয়া বলিলেন, এন্‌জয় করছ ? দাঁড়াও দাঁড়াও, এই সবে সন্ধে !

তাই কী ? জীবনের এটা কোন তিথির সন্ধ্যা বুঝিবার চেষ্টা কবা বৃথা। এমনই সাধারণ তিথিটা আজ কী ছিল, শঙ্কব তাই মনে করিবার চেষ্টা করিল। পূর্ণিমার কাছাকাছি হইবে, হয় এদিক নয় ওদিক। মনটা কেমন কবিতে লাগিল শঙ্করের। পরীক্ষার পড়া করিতে করিতে কতবার জানালা দিযা বাহিবের জ্যোৎস্না দেখিয়া, ছাদে হোক, মাঠে হোক, ঘাটে হোক জ্যোৎস্নায় চুপচাপ অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিবার যে সাধটা দুর্দমনীয় হইয়া উঠিত, কত কষ্টে পরীক্ষা শেষ হওয়ার জন্য সাধটা সে তখন সংযত করিত ! হোক না ছেলেমানুষি, এ সব চিবন্তন ছেলেমানুষিব দাম কোনোদিন কমে না মানুষের। এখানে সে কেন আসিযাছে ? এই কড়া আলো, চড়া নির্লজ্জতা, কুৎসিত গুন্ডামিব আবহাওযায় ? কোমলতা বিসর্জন দিতে ? নিজের যে কোমলতাব জন্য তবঙ্গেব কথা ভাবিযা এখনও তার মন কেমন কবিতেছে ?

বাকি সকলেও কি এই উদ্দেশ্যে আসিযাছে এখানে, এই নাবী-পুরুষেব দল ? নিজের কোমলতা যে নিজেকে কষ্ট দেয়, এই বোগেব চিকিৎসা কবিতে ?

মাঝবযসি মাংসল মেয়েবাও যে এখানে আসিযা বোগটার হাত হইতে বেহাই চান, একটু পরেই শঙ্কর তা চমৎকার বুঝিতে পাবিল। বিদেশি পোশাক-পবা একটা হ্যাংলা পোকার সঙ্গে যে মহিলাটি সটান তাদের টেবিলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, মুখের রং তাঁব খাঁটি রং। মিসেস সেন তিনি, নমিতা নাম। লীলাময়ের যে তিনি বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সেটা বোঝা গেল খাপছাড়া অভ্যর্থনার জবাবে লীলাময়ের ঘাড়ে তাঁর ছোটো একটি চড় মারায।

আড়চোখে শঙ্করেব দিকে চাহিয়া তিনি বসিলেন। উঠিলেন একঘণ্টা পরে। বলিলেন, আপনার গাড়িটা বাইরে দেখছিলাম কেদারবাবু, এ সব তো অনেক খেলাম, একটু হাওয়া খাওয়াবেন ?

কেদারনাথ ব্যস্ত হইযা বলিলেন, নিশ্চয, নিশ্চয়।

মিসেস সেন গাড়িতে উঠিলেন আগে, উঠিয়াই বলিলেন, আসুন শঙ্করবাবু আপনি, আপনার সঙ্গে আজ প্রথম আলাপ হল, আপনি আমাব পাশে বসবেন। ডায়মন্ডহারবারেব দিকে যাওয়া যাক, কেমন ?

শহরে চাঁদের আলো নাই, শহরের বাহিরে চাঁদের আলোর ছড়াছড়ি। পথের ধারে লাইট রেলওয়ের লাইন পাতা, দুদিকে মাঠ, মাঝে মাঝে বাড়িঘর ও গাছপালায় জমাটবাঁধা আবছা আবছা গ্রাম। কোমলতা-ব্যারামের চিকিৎসাটা জীবনে আজ প্রথম হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয় শঙ্করের স্রেফ কান্না আসিতে লাগিল। এমন অদ্ভুত রকমের কোমল মনে হইতে লাগিল নিজেকে যে, বাঁদিকে লীলাময়েব পকেটের সিগারেটের কেসটার চেয়ে ডাইনে মিসেস সেনের কোমল শরীরটা বেশি বিঁধিতে লাগিল তার দেহে। ডাইনির নখের মতো।

মিসেস সেন বলিলেন, একবার এদিকে এসে তালের রস খেয়ে গিয়েছিলাম মনে আছে কেদারবাবু ? আহা কী স্বাদ টাটকা তালের রসের !—আজও জিভে জড়িয়ে আছে, কেবল গন্ধটা ভারী বিশ্রী।

মিসেস সেনের জড়ানো জিভে তালের রসের স্বাদ জড়াইয়া থাকা আশ্চর্য নয়, শঙ্করের হৃদয় কিন্তু একবার স্পন্দিত হইতে ভুলিয়া গেল।

মিসেস সেন আবার বলিলেন, গ্রামটা চিনতে পারবেন ? কাছাকাছি এসে পড়েছি নিশ্চয়। চলুন না একটু চেখে আসি ? রাত্তির বেলা তালের রস—কী মজাই হবে।

বস্তুতান্ত্রিকতার এই রোমান্সের পরিচয় শঙ্কর ভাসাভাসা ভাবে রাখিত—লোকের মুখে শুনিয়াছে, মনস্তত্ত্ববিদের মুখে। রোজ যে পাঁচসিকা দামের সাবান মাখে, ধুলায় গড়াগড়ি দেওয়া নাকি তার কাছে রোমান্সের চরম। অপরাহ্ণ হইতেই নিজের মনের মধ্যে বসিয়া নিজেকে শঙ্কর ঘৃণা করিতেছিল, এখন রীতিমতো চাবুক মারিতে আরম্ভ করিয়াছে। তবু , সেই যন্ত্রণাতেই যেন সে একটা অদ্ভুত বেপরোয়া ভাব অনুভব করিতে লাগিল, বোধ করিতে লাগিল নিজেকে নিজে পীড়ন করার মতো অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিবার তাগিদ। মেরুদণ্ড টান করিয়া এতক্ষণ সে সোজা হইয়া বসিয়াছিল, এবার মিসেস সেনের দিকে একটু ঠেসান দিয়া বসিল। তাতে খুশি হইয়া মিসেস সেন হোটেলে লীলাময়ের ঘাড়ে যেমন একটা চড় মরিয়াছিলেন, শঙ্করকেও তেমনই একটা চড় মারিয়া আদর করিলেন। লীলাময়ের সিগারেটের আগুনে তার আংটির পাথবটা বিপদজ্ঞাপক লাল আলোর মতোই চমকাইয়া উঠিল।

মাইল দেড়েক গিয়া পাওয়া গেল একটা গ্রাম। তখনও গ্রামের আলো নেভে নাই, পথের ধারে ছোটো ছোটো দোকানগুলি বন্ধ হয় নাই। তাড়ির দোকানটা গ্রাম পার হইয়া একটু তফাতে। দেখা গেল, দোকানের খানিক দূরে ছোটোখাটো একটি ভিড় জমিয়াছে, দোকানের সামনে পুলিশ।

লীলাময় সভয়ে বলিলেন, পিকেটিং হচ্ছে।

পিকেটিং ?—মিসেস সেনের শিহরন অনুভব করিয়া শঙ্করের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

মিসেস সেন আবার বলিলেন, কাজ নেই তালেব রসে বাবা, মানে মানে এখন ফিরে যাওয়া যাক।

গাড়ি ফিরাইতে ফিরাইতে দেখা গেল, ষোলো-সতেরো বছর বয়সের একটি ছেলে পিকেটিং করিতে গিয়া পুলিশের হাতে পড়িল।

ব্যাক করিবাব সময় গাড়ির পিছনের চাকা নর্দমাব কাদায় ডুবিয়া গেল। কেদার ড্রাইভারকে এমন একটা গাল দিলেন যে অদূরে তাড়ির আড্ডায় যারা রোজ তাড়ির সঙ্গে গালাগালির রসও উপভোগ করে, শুনিলে তারা নিশ্চয় সমস্বরে বলিত, সাবাস ! এখানে কেউ কিছু বলিল না, মিসেস সেন শুধু খিলখিল করিয়া একটু হাসিলেন। নর্দমা ছাড়িয়া উঠিবার চেষ্টায় গাড়ির ইঞ্জিন পরক্ষণে গর্জন করিয়া উঠিল, শঙ্করের মনে হইল মিসেস সেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়া গাড়িটাও যেন হাসিতেছে।

মাথার মধ্যে সব ওলট-পালট হইয়া যাইতেছিল শঙ্করের। সবই সে বুঝিতে পারিতেছে, তবু যেন সব আবছা, এলোমেলো—কোথায় ছিল সে, কী করিয়া কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে সব তার মনে আছে, তবু যেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না, কিছুই স্মরণ হইতেছে না। কয়েক ঘণ্টা আগের অতীত একান্ত অবাধ্য হইয়া ভবিষ্যতের কল্পনার মতো স্মৃতির আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। আর ভিতরে একটা কষ্ট হইতেছে অকথ্য। একসঙ্গে আগুনে পোড়া আর শীতে জমিয়া যাওয়ার মতো অদ্ভুত যন্ত্রণা।

গাড়ি নর্দমা হইতে উঠিয়া ফিরিয়া চলিল। গ্রাম পার হইয়া যাওয়ার পর শঙ্কর বলিল, আমার গা কেমন করছে।

মিসেস সেন সভয়ে বলিলেন, সেরেছে ! সবুন, সবুন, ওদিকে সবুন, ওদিক দিয়ে মুখ বার কবুন।

গাড়ি বাঁধিতে বলিয়া ব্যাকুলভাবে শঙ্করকে তিনি দুহাতে দূরে ঠেলিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গাড়ি থামামাত্র দরজা খুলিয়া টুক করিয়া নামিয়া গেলেন। শঙ্করকে বলিলেন, আপনি নেমে আসুন তো।

শঙ্কর পথে নামিয়া দাঁড়াইলে মিসেস সেন বলিলেন, পথের ধারে বসে বমি করে নিন। একটু সরে যান, বমিকে আমি বড্ড ঘেন্না করি। আপনারা নামুন না একজন কেউ, একটু হেলপ্ করুন না ওঁকে ? আচ্ছা, তুমিও তো নামতে পার ? নামো, আমি সামনের সিটে বসব।

মিসেস সেনের সেই সঙ্গী চুপচাপ সম্মুখের আসনে বসিয়াছিলেন, চুপচাপ নামিয়া আসিলেন। মিসেস সেন সেখানে উঠিয়া বসিলেন।

শঙ্কর বলিল, আপনিও উঠে বসুন আমি হেলপ্ চাই না।

মিসেস সেন মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, বমি করবেন বললেন যে ?

কখন বললাম ?

তবে গাড়িতে উঠুন, তাড়াতাড়ি এখন টাউনে ফিরতে পারলে বাঁচি।

আপনারা যান, আমি গ্রামে ফিরে যাব।

বলিয়া শঙ্কর গ্রামের দিকে হাঁটিতে আরম্ভ করিল।

লীলাময় হাঁকিযা বলিলেন, পাগলামি কোরো না শঙ্কর, গ্রামে গিয়ে কী করবে ?

পিকেটিং করব।

আরও কয়েকটা আহ্বান আসিল, শঙ্কর কানে তুলিল না, একটু টলিতে টলিতে সোজা আগাইয়া চলিল। খানিকদূব গিয়া গাড়ি ছাড়িবার শব্দ কানে আসিতে সে মুখ ফিরাইয়া চাহিল। তারপর আবার গ্রামের দিকে আগাইয়া চলিল। এবার চলিল আস্তে। গ্রাম বেশি দূরে নয়। এই নাম-না-জানা গ্রামের তাড়িখানায় পিকেটিং করিয়া পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আগে যতটুকু সময় পারা যায় পরীক্ষা শেষের জন্য তুলিয়া রাখা এই জ্যোৎস্নাকে একটু উপভোগ করা যাক। আজই তো তার পরীক্ষা শেষ হইয়াছে।

কিন্তু পিকেটিং শঙ্কর কেন করিবে ? কে মাথার দিব্য দিয়াছে ? শঙ্কর তা জানে না। তার কেবল মনে হইতেছিল, আজ সারাদিন সে অনেক সুখ উপভোগ করিযাছে, এবার কিছু দুঃখ তাকে সংগ্রহ করিতেই হইবে।

## চার

সাধনার যে বিজন ঠাকুরপো তরঙ্গের বাবা, তিনি ছিলেন প্রফেসর। বছর দুই তরঙ্গ যে স্বামীর ঘর করিয়াছে, তিনিও ছিলেন প্রফেসর—তরঙ্গের বাবার চেয়ে বড়ো ডিগ্রিধারী আর বেশি নামকরা। দুজন প্রফেসরের কাছে কত কিছুই যে তরঙ্গ শিখিয়াছে। তবে বাঙালির মেয়ে-বউ যা কিছু শেখে শুধু কল্পনা করার জন্যই শেখে—এবং কল্পনা করিতে করিতে কারও কারও কল্পনা আকাশপাতাল ছাড়াইয়া ও ছড়াইয়া যায়। যন্ত্রের মতো এটা করিয়া গেলে কেউ বিশেষ কিছু মনে করে না, বড়ো জোর আনমনা উড়ুউড়ু স্বভাবের জন্য একটু নিন্দা রটে। লোকে বলাবলি করে যে, এর বড়ো আনমনা উড়ুউড়ু স্বভাব, এ যদি সর্বনাশ না করে ছাড়ে তো আমার কান কেটে নিয়ো ! কিন্তু এমন

উদ্‌ভ্রান্ত যদি কারও কল্পনা হয় যে, লোকের বলাবলির ভয় না করিয়া কল্পনাটা পরিণত করিতে যায় কাজে, তখন বাধে সাংঘাতিক গোলমাল। এমন গোলমাল বাধে যে, তরঙ্গের স্বামীর মতো পুরাপুরি আধুনিক স্বর্গীয় স্বামীর আধা-আধুনিক আত্মীয়স্বজনের আশ্রয়ে সে টিকিতে পাবে না।

তার উপর যখন বাপের বাড়ি বলিয়া কিছু না থাকে, আর অন্য কোনো আত্মীয়ের বাড়ি বাস করা যে সম্ভব হইবে না তাও ভালো করিয়া জানা থাকে, তখন তরঙ্গের মতো মেয়ে সাধনাব মতো কারও বাড়িতে আসিয়া বাস করে,—যার সঙ্গে সম্পর্কটা আসলও নয়, নকলও নয়, তবু অতীব ঘনিষ্ঠ।

তবে আশ্রিতা হিসাবে নয়, খরচ দিয়া। প্রফেসর বাবা, প্রফেসর স্বামী তরঙ্গের জন্য কিছু টাকা রাখিয়া গিযাছেন।

শ্বশুর-শাশুড়ির জন্য দেবর-ভাসুরের প্রকাণ্ড সংসার ছাড়িয়া তরঙ্গ তার কাছে আসিয়া থাকিতে চায় শুনিয়া সাধনা যেমন আশ্চর্য হইয়াছিলেন, মাসেমাসে নিজের খবচ বাবদ সে টাকা দিবে শুনিয়া হইয়াছিলেন তেমনি আহত।

কেন ? একবেলা দুটি খাবে, তাও আমি তোমায় দিতে পাবব না তবু ?

তরঙ্গ একটু হাসিয়া বলিয়াছিল, একবেলা তো খাব না খুড়িমা। চারবেলা খাব। খাওয়াদাওয়া চলাফেরার সব নিয়মকানুন আমি ঠিক করে ফেলেছি। আমাব নিজের নিযম মেনে চলতে চাইলাম বলেই তো ওখানে সবাই খেপে গেল। তবে আমি যাই করি খুড়িমা, তোমাব কোনো অসুবিধা হবে না, তোমার অত কুসংস্কার নেই জানি বলেই তো তোমার কাছে এলাম।

সাধনা বলিয়াছেন, সংসারে যা খুশি তাই করলে কি চলে তবু ?

সে রকম যা খুশি তাই করা তো নয়,—অসংযমের কথা ভাবছ তো ? আমাব সংযম দেখে তুমি ভয় পেয়ে যাবে খুড়িমা। যা দরকার নেই তা কবব না, যা দরকাব নেই তা খাব না, যা দবকাব নেই তা ভাবব না—

অনেকক্ষণ ধরিয়া তরঙ্গ সাধনাকে বুঝাইতেছিল,—তাব জীবনেব লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সাধনাব কথা। স্তরে স্তরে জীবনকে সে ভোগ করিয়া ফেলিবে, এখন তো উনিশ বছর বয়স তার, চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত ঘরের কোণে সে দেহমনকে বশ করিবার শক্তি অর্জনের জন্য তপস্যা কবিবে, ত্রিশ বছব বয়স পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি শুধু অন্তঃপুরে ঘুরিয়া মেয়েদেব বাঁচিয়া থাকিতে শিখাইবে, আর সেই সঙ্গে নিজেও শিখিয়া লইবে কী করিয়া অজানা-অচেনা মেয়েদের নানা কথা শিখাইতে হয়, তাবপর আরম্ভ করিবে আসল কাজ—প্রবল প্রকাশ্য আন্দোলন, দেশকে যা ভাসাইয়া লইযা যাইবে, ঘরে ঘবে হইচই বাধাইয়া দিবে।—একটু বয়েস না হলে তো কেউ আমার কথা শুনবে না খুড়িমা।

শুনিতে শুনিতে সাধনার ধাঁধা লাগিযা গিয়াছিল, মনে হইয়াছিল, আহা, এই বয়সে শোকে তাপে মাথাটা খারাপ হইয়া গিয়াছে মেয়েটার। ওকে তো একটু স্নেহমমতা করা দরকাব !

সেদিন তিনি তর্ক করেন নাই, প্রতিবাদও করেন নাই, শুধু বলিয়াছিলেন, আচ্ছা সে তো পরের কথা—যে ভাবে ভালো লাগে, তুমি সেই ভাবে এখানে থেকো তবু, কিন্তু টাকাপয়সার কথাটা তুলো না, তুমি আমার মেয়ের মতো, খাইখরচ বাবদ তুমি আমায় টাকা দেবে, আমার তা সইবে না বাছা।

তরঙ্গ বলিয়াছিল, কেন সইবে না খুড়িমা ? আমার যদি না থাকত, তা হলে অন্য কথা ছিল। তা ছাড়া, তুমি যদি খরচ না নাও, আমি এখানে থাকব না।

সাধনা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এও তরঙ্গের মাথা খারাপ হওয়ার একটা লক্ষণ। আর কিছু তিনি বলেন নাই।

কিন্তু স্নেহমমতা করিতে গিয়া দেখিযাছিলেন, তরঙ্গ ও সব চায়ও না, তরঙ্গের ও সব প্রয়োজনও নাই। দৈনন্দিন জীবনযাপনের যে প্রণালি সে ঠিক করিয়াছে, তার মধ্যে হৃদয়টা গিয়াছে

একেবারে বাদ। সুখ, সুবিধা, আলস্য, আনন্দ, উপভোগ, এ সমস্তের জন্য এতটুকু ফাঁক সে প্রতিদিনকার জীবনে রাখে নাই। ঠিকাঝিকে তরঙ্গ দুদিনের মধ্যে বিদায় দিল, নর্দমা আর বাড়ির নর্দমার চেয়ে নোংরা অংশ সাফ করিবার জন্য যে মেথর আসিত, তারও আসা বারণ হইয়া গেল।

না খুড়িমা বাধা দিও না। এ সব আমার দরকার।

বাসন মাজা, জল তোলা, মশলা বাটা, রান্না করা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, কাপড় কাচা, বিছানা তোলা, জামা সেলাই করা, যত কিছু কাজ আছে বাড়িতে, মনে হইল সব যেন তরঙ্গ একা অধিকার করিতে চায়।

না খুড়িমা, বাধা দিয়ো না এ সব আমাব দরকার।

এত কাজ করে কেউ বাঁচে তবু ? রাত জেগে তুমি আবাব বই পড়।

অতিরিক্ত কিছু তো করব না খুড়িমা। কতটা কাজ আমার সইবে তা জানি না, কী নিয়মে কখন কী করলে ভালো হয় তা তো জানি না,—তাই পরীক্ষা করার মতো এ ভাবে আরম্ভ করেছি। আস্তে আস্তে কমিয়ে বাড়িয়ে সময় বদলে খাপ খাইয়ে নেব খুড়িমা, কিছু ভেব না। রাত জেগে পড়া চলবে না, সেটা বুঝতে পেরেছি। আজ থেকে দুপুরে সেলাই না করে পড়ব।

ধীবে ধীরে তাই করিযাছে তরঙ্গ, খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছে। কয়েকটা কাজ ছাড়িয়া দিয়াছে, অসহিষ্ণু ব্যস্ততার সঙ্গে অতিবিক্ত কম সময়ে যে সব প্রয়োজনীয় কাজ করিত, সে সব কাজে সময় দিতে আরম্ভ করিয়াছে, সকালের কোনো কাজ লইয়া গিয়াছে বিকালে, বিকালের কোনো কাজ লইয়া আসিয়াছে সকালে।

মাস তিনেক পরে বাড়িতে মেথরকে আসিবার অনুমতিও দিয়াছে।

এমন যে তরঙ্গ তাব জন্য একদিনে শঙ্কর কম কাণ্ড করে নাই। গরমে ও গুমোটে ভ্যাপসা একটা দিনে পরীক্ষাব হলে বসিযা তিন ঘণ্টা ধবিযা লিখিয়াছে প্রশ্নপত্রের জবাব, হৃদয় বিনিময় করিতে গিয়া তরঙ্গের সঙ্গে করিযাছে মাথা ঠোকাঠুকি, তিন হাজার লোকের সামনে পরিচয দিয়াছে মাথা খারাপ হওয়ার, হোটেলে গিযা জীবনে প্রথম টানিয়াছে পেগ, তারপর শহরের অনেক দূবে তাড়ির দোকানে পিকেটিং করিয়া গিয়াছে জেলে।

অথচ অনুপমের মাবফতে খবরটা শুনিয়া তবঙ্গ শুধু বলিল, মোটে একুশ দিন !

সাধনা ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, শঙ্করের আবও বেশি দিন জেল হলে তুমি বুঝি খুশি হতে তবু ?

তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে বলিল, তা হতাম। এ তো জেল নয় খুড়িমা, ওষুধ। একুশ দিন জেলে থেকে ভাবপ্রবণতা যদি একটু কমে তো শঙ্কবদা বাঁচবে।

কী যে বলো তুমি ঠিক নেই।

ঠিক কথাই বলি। শুনতে ভালো লাগে না।

সাধনা গম্ভীব মুখে বলিলেন, নাই বা বললে ঠিক কথা ? যা শুনতে ভালো লাগে না মিছিমিছি তা বলবার দরকার ? মিষ্টি কথা বলা আর দশজনের সঙ্গে মানিয়ে চলা হল মেয়েমানুষের কাজ, এমন কথা যদি খালি খালি তুমি বল যা শুনলে মানুষের রাগ হয়, তোমায় তো কেউ দুচোখে দেখতে পারবে না বাছা !

কিন্তু কেউ যদি ঠিক কথা না বলে, সব যে তাহলে বেঠিক হয়ে যাবে ?

তুমি ঠিক কথা বললেই কি সব ঠিক হয়ে যাবে ভাব ?

খানিকটা তো হবে।

সাধনা রাগ করিতে ভালোবাসেন না। প্রুফ রিডারের মতো তিনি শুধু সংশোধন করিযা যান,—মানুষকে আর সংসারকে। বানান-না-জানা প্রুফ রিডারের মতো হয়তো ভুলের সংশোধনেও

তাঁর ভুল হয়, যা ভুল হয় তার সংশোধনও ভুল হয়, কিন্তু সে জন্য তিনি সংশোধন করিতে কোনো অসুবিধা বোধ করেন না। কারণ, তিনি নিজে তো জানেন, তিনি যা সংশোধন করিয়াছেন তাই ঠিক। কিন্তু বাংলা প্রুফ রিডারের সংস্কৃত প্রুফ দেখার মতো, তরঙ্গের বেলায় তিনি পড়েন বিপদে। তরঙ্গকে শোধরাইতে গেলেই তাঁর মনে হয়, নিমি আর অনুপমের বেলা যে জ্ঞান, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা তিনি কাজে লাগান, এর বেলা সে সব কাজে লাগিবে না। সংসারে কী নিয়মে চলা উচিত সে উপদেশ তিনি যেন দিতে বসিয়াছেন সন্ন্যাসিনীকে !

তরঙ্গ তর্ক তুলিলেই সাধনার উপদেশ তাই পরিণত হয় মিনতি ও আপশোশে। মাথা নাড়িয়া তিনি বলেন, না তবু, তোমার কথাবার্তা চালচলন দেখে আমার বড়ো ভাবনা হয়। কারও-না-কারও আশ্রয়ে মেয়েমানুষকে থাকতেই হবে, সবাই যদি তোমার কথা শুনে বিরক্ত হয়—

তরঙ্গ আর তর্ক করে না, করে কাজ। সাধনা কাজের খুঁত ধরিলে নীরবে সায় দিয়া খুঁত সংশোধন করে। কিন্তু গভীর একটা জ্বালা বোধ করে তরঙ্গ, একটা অচিন্তিত আত্মগ্লানি জাগে। এখন তার তপস্যার সময়, বিরাট এক ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে সে তৈরি করিতেছে তবু, সাধনাব মতো মানুষকে এই সব তুচ্ছ ছোটো ছোটো কথাগুলিও যদি সে এখন বুঝাইতে না পারে, তপস্যা সাঙ্গ করিয়া সাধনার চেয়েও অপদার্থ হাজার হাজার মানুষকে আরও বড়ো, আরও ব্যাপক কথাগুলি সে কি বুঝাইতে পারিবে ? প্রতিদিন এত যে কষ্ট সে করিতেছে, শেষ পর্যন্ত হয়তো তার কোনো ফলই ফলিবে না। মানুষের মধ্যে নিজে সে কেবল হইয়া থাকিবে অদ্ভুত, বেমানান।

ভাতের হাঁড়িতে চাল দিয়া চিংড়িমাছ সিদ্ধ রাঁধিবার জন্য সরিষা বাটিতে বসিয়া তরঙ্গ এই গ্লানি ও হতাশার ভাব দমন করিবার চেষ্টা করে, এ চেষ্টাও তার তপস্যার অঙ্গ। দুঃখ, বেদনা ও হতাশাকে সে মনে স্থান দিবে না বলিয়া নয়, সমস্ত বাহুল্য মনোভাবকে, সমস্ত বাহুল্য সহানুভূতিকে ইচ্ছামতো দমন করিবার ক্ষমতা তার চাই। হাজার হাজার নরনারী একদিন তাহার কথা শুনিতে বাজি হইবে কি না, এ সমস্যাব বিচার করিতে সে রাজি আছে, কারণ সেটা প্রয়োজনীয় চিন্তা, কিন্তু সমস্যার বিচারের সঙ্গে মনটা খারাপ করিয়া ফেলিতে সে রাজি নয়। কী লাভ আছে মন খারাপ করিয়া ? তার জীবনে তার জীবনের পরিকল্পিত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে, মন খারাপ করা কোন কাজে লাগিবে ? কী যুক্তিই বা আছে মন খারাপ করিবার ? এই অনাবশ্যক বাহুল্য মানসিক অবস্থাটাকে কেন সে প্রশ্রয় দিবে ?

সরিষা বাটা শেষ হইয়া যায়, তবু তরঙ্গের মন কিন্তু ভালো হয় না। সে একটু আশ্চর্য হইয়া যায়, ভাবে যে, প্রায় দুবছর চেষ্টা করিয়া নিজের মনকে সে এটুকু বশও করিতে পারে নাই কি ? ভাবিয়া আরও বেশি খারাপ হইয়া যায় মন। তখন তরঙ্গ বুঝিতে পারে, মনের একটা চাপাপড়া জটিল আবর্ত আজ মুক্তি পাইয়াছে। মন খারাপ হওয়া দমন করিবার চেষ্টার মধ্যে আজ পর্যন্ত তার মন খারাপ হওয়ার কারণের কারখানা বসিয়াছে। আজ তার মহা পরীক্ষার দিন।

গরমের দিন। রান্নাঘরে আরও বেশি গরম। তরঙ্গ ঘামে ভিজিয়া যায়। গরমের দিনে উনানের গরমে ঘামে ভিজিবার একটা কষ্ট আছে, এতদিন এ কষ্ট সহ্য করিতে তরঙ্গ গর্ব বোধ করিয়াছে, আজ তার মনে হইতে লাগিল, এ সব অকারণ, যাচিয়া এ কষ্ট সহ্য নিছক বোকামি। এ রকম কথা মনে হওয়ার জন্য রাগে তরঙ্গের গা জ্বালা করিতে লাগিল। গা জ্বালা করিবার জন্য নিজের উপর তার অভিমানের সীমা রহিল না। আর অভিমানের সীমা না থাকায়—

একটা বেতের মোড়া আনিয়া অনুপম রান্নাঘরে বসিল।

ঘামলে তোমায় যেন কী রকম দেখায় তরঙ্গ।

কী রকম দেখায় ?

রোদের মধ্যে বৃষ্টি হলে যেমন দেখায় তেমনই।

তরঙ্গ ভাত টিপিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল ভাত সিদ্ধ হইয়াছে কি না। হাত ধুইয়া একদিকের দেয়ালে বসানো লম্বা কাঠের তাক হইতে এক প্লেট কাসুন্দি-মাখা জাম পাড়িয়া অনুপমকে দিল। তারপর ঢাকনি-লাগানো অ্যালুমিনিয়মের পাত্রে চিংড়িমাছে নুন-মশলা মাখিতে মাখিতে বলিল, আর কেউ এ রকম কবিত্ব করলে আমার গা জ্বলে যায়, কিন্তু তোমার মুখে শুনলে খারাপ লাগে না। কবিত্ব করাটা বোধ হয় তোমার পক্ষে স্বাভাবিক অনুদা।

অনুপম জামের বীচি উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিল, কবিত্ব করলাম বুঝি ? কথাটা মনে হল, তাই বললাম।

এ রকম কথা মনে হওয়া আর বলাকেই কবিত্ব করা বলে। সরল ভাবে কবিত্ব কর বলেই বোধ হয় তোমাকে সইতে পারি। তা ছাড়া, তোমার আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি, তোমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। দুবছর ধরে বলে বলে তোমার সিগারেটটা পর্যন্ত ছাড়াতে পারলাম না !

অনুপম হাসিয়া বলিল, তুমি বল বলেই একেবারে ছাড়িনি। তোমার হুকুম শুনব কেন ?

তরঙ্গ মুখ তুলিয়া বলিল, হুকুম আবার কীসের ? খুড়িমাকে এত হিসেব করে সংসার চালাতে হয়, তোমার একটা পয়সা নষ্ট করা উচিত নয়।

মার পয়সা তো নষ্ট করি না, আমাব টিউশনির টাকায় খাই।

তাই বা খাবে কেন ? সিগারেটে যে টাকা উড়িয়ে দাও, খুড়িমাকে সে টাকাটা দিতে পার না।

অনুপম একটু অস্বস্তি বোধ করিযা বলে, সেই জন্যেই তো কমিয়ে দিয়েছি, একটা-দুটোর বেশি খাই না।

তরঙ্গ মুখ নামাইয়া বলে, একটা দুটো নয়। কাল বেলা দশটার সময় এক প্যাকেট কিনে এনেছিলে, রাত্রে ঘুমোন পর্যন্ত ছটা খেয়েছ।

এ কথায় লজ্জা পাওয়ার বদলে অনুপম আশ্চর্য হইয়া বলিল, তুমি গুনে দেখেছ না কি ?

গুনব না ? আলো জেলে ঘুমোও কেন ?

আমি আলো জেলে ঘুমোই বলে কটা সিগারেট খেযেছি গুনে দেখেছ, ব্যাপারটা ঠিক মাথায় ঢুকল না।

তরঙ্গ এবার হাসিল।

কাল আলো নেভাতে গিয়ে তোমার পকেট থেকে প্যাকেট বার করে গুনে দেখেছি।

অনুপম গম্ভীব হইয়া বলিল, তুমি তা হলে চুপিচুপি আমার পকেট হাতড়াও ?

চুরি করার জন্য হাতড়াই না কিন্তু।

অনুপম গম্ভীর মুখে খানিকক্ষণ তবঙ্গের ঘামে-ভেজা মুখখানা নিরীক্ষণ করে,—আবিষ্কারকের দৃষ্টিতে। তারপর মৃদুস্ববে বলে, মাঝে মাঝে আমাব পকেটে খুচরো পয়সা বেড়ে যায় তা জান ?

জানি বইকী। আমি বাড়িয়ে দিই, আমি জানব না তো কে জানবে ?

কেন বাড়াও ?

খুড়িমার জন্যে। পকেটে পয়সা না থাকলেই তো খুড়িমার কাছে হাত পাতবে।

রান্নাঘরের গরমে নয়, অপমানে মুখ লাল করিয়া অনুপম বসিয়া থাকে।

তরঙ্গ নীরবে নির্বিকার চিত্তে চিংড়ি-মাছ সিদ্ধ করার পাত্রটির ঢাকনি ভালো করিয়া বন্ধ করে, তাকের উপর হইতে সরু খানিকটা তার লইয়া পাত্রটি জড়াইয়া জড়াইয়া বাঁধে। তখনও অনুপমের মুখে লালাভ মেঘ সঞ্চারিত হইয়া আছে দেখিয়া বলে, এতে রাগ করার কী আছে ? সহজ সরল ব্যাপারকে ঘোরালো কোরো না অনুদা। আমি প্রত্যেকটি পয়সার হিসেব রেখেছি, যখন রোজগার করবে শোধ দিয়ে দিয়ো—না হয় সুদও দিয়ো কিছু, তিন কি চার পারসেন্ট। আমি তোমায় দান করিনি, ধার দিয়েছি।

অনুপম রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বলিল, তুমি আমার সঙ্গে কথা বোলো না, খপরদার !

রাত্রে অনুপম আলো জ্বালিয়া রাখিয়াই ঘুমাইয়া পড়িল। আলো নিভাইতে গিয়া তরঙ্গ আলো নেভানোর বদলে বিছানার কাছে গিয়া অনুপমের ঘুমন্ত মুখখানা একটু দেখিয়া বলিল, ঘুম আসেনি, চোখের পাতা কাঁপছে।

শ্লেষ নয়, তরঙ্গ শ্লেষ করিতে জানে না !

অনুপম চোখ মেলিয়া বলিল, কেন জ্বালাতন করছ ? তোমার জ্বালায় একটু ঘুমোতেও পাব না ?

আমারও ঘুম আসছে না। চলো একটু বেড়িয়ে আসি।

এত রাত্রে ?

রাত্রি ছাড়া শহরের রাস্তায় ভিড় ঠেলে বেড়ানো যায় ? ওঠো, জামা পরে নাও।

তরঙ্গের মুখে এমন শ্রান্ত গাম্ভীর্য অনুপম কোনোদিন দেখে নাই। আর কথা বলিবার সাহস তার হইল না। উঠিয়া জামাটা গায়ে দিয়া পাম্পশুতে পা ঢুকাইয়া সে প্রস্তুত হইয়া লইল।

সাধনার তন্দ্রা আসিয়াছিল। তরঙ্গ তাঁকে ডাকিয়া তুলিল।

আমরা একটু বেড়াতে যাচ্ছি খুড়িমা।

এত রাত্রে !

গরমে শরীরটা কেমন করছে।

সাধনা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, বেড়াতে হয় ছাতে গিয়ে পায়চারি করো। এত রাত্রে রাস্তায় বেড়াতে যেতে হবে না।

তরঙ্গ উদ্ধত ভঙ্গিতে প্রশ্ন করিল, কেন ?

কেন তাও তোমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে ? এটুকু বুঝবার ক্ষমতা তোমার নেই ?

একা তো যাচ্ছি না, অনুদার সঙ্গে যাচ্ছি।

অনু যাবে না।

তবে আমি একাই যাব। দরজাটা দিয়ে যাও তো অনুদা।

সোজা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া তরঙ্গ বাহির হইয়া গেল। একটু দ্বিধা করিয়া সাধনা বলিলেন, সঙ্গে যা অনু। কাল ওকে স্পষ্ট বলে দেব আমার বাড়িতে ওর আর থাকা চলবে না।

এ বাড়িতে আত্মীয়েরা সংবাদ পাইয়াছে কেবল শঙ্করের শেষ কীর্তিটির। কারও লাগিয়াছে চমক, কেউ হইয়াছে অবাক, কারও লাগিয়াছে মজা, কেউ করিয়াছে আপশোশ। কারণটা অনুমান করিতে পারিয়াছে সকলেই। পরীক্ষা খারাপ হওয়ার প্রতিক্রিয়া। লজ্জা ঠিক নয়,—লজ্জার জন্য হইলে শেষদিনের পরীক্ষা দিয়া শঙ্কর এ কাজ করিত না, এখন তো আর কেউ জানে না সে কেমন পরীক্ষা দিয়াছে ! আত্মীয়স্বজনকে মুখ না দেখানোর জন্য হইলে শঙ্কর জেলে যাইত পরীক্ষার ফল বাহির হইলে,—তার এখন অনেক দেরি। একাজের প্রেরণা শঙ্করকে দিয়াছে, দুঃখ, গ্লানি, যন্ত্রণা—'রিঅ্যাকশন'। কিন্তু শঙ্করের মতো ছেলে এমন পাগলামি করিল কেন ? এত যে ফিটফাট থাকা তার স্বভাব, অসংখ্য ছোটোবড়ো আরাম ছাড়া যে তার দিন চলে না—জেলে সে এ সব পাইবে কোথায় ? আহা বড়ো কষ্ট হইবে ছেলেটার।

শঙ্করের মা একটু কাঁদিলেন, বীরেশ্বরকে বলিলেন, চুরি-ডাকাতির জন্যে তো নয়, জেলে ওকে ঢা খেতে দেবে তো বাবা ?

সীতা পিসিমা বলিলেন, উঃ ! কী আশ্চর্য মন মানুষের ! পড়তে পড়তে আমায় বলত, এগজামিন শেষ হলে রোজ তিনবার করে সিনেমায় যাবে, আর যেই না এগজামিন শেষ হওয়া,

পিকেটিং করে বাবু গেলেন জেলে ! বুঝতে পারছ বউ, মানুষের মন কী রকম আশ্চর্য জিনিস ? সাধ ছিল সিনেমা দেখার, সাধ মেটাল জেলে গিয়ে !

দেখা গেল, শঙ্করের কীর্তিতে সব চেয়ে বিচলিত হইয়াছেন রামলাল।

রামলালেব দোষ নাই। সেদিন সন্ধ্যায বামলালও সেই হোটেলে ছিলেন—প্রায়ই থাকেন।

ছেলেকে তিনি হোটেলে ঢুকিতে দেখিযাছিলেন, পেগ টানিতেও দেখিযাছিলেন। এ অবস্থায় বাপের পক্ষে একটু বিচলিত হওয়াই স্বাভাবিক।

রামলালেব অনুভূতি বড়ো ভোঁতা, মানুষটা তিনি তাই নির্বিকার। এত বেশি নির্বিকার যে মদে তাঁব না হয় নেশা, না জাগে বিকাব। কেবল সাধাবণ অবস্থায় কিছু ভালো-না-লাগা আব কিছু খারাপ-না-লাগার অস্বাভাবিক স্থায়ী সমন্বয়ের মধ্যে, কিছু ভালো-না-লাগাটা মদেব শাসনে স্বাভাবিক হইয়া ওঠে,—তিনি মনে করেন, তাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট বৈচিত্র্য, পবম লাভ। জীবনে তাঁর কোনো স্বাদ নাই, জীবনটা তাই সাধারণভাবে বিস্বাদ করিয়াই তিনি কৃতার্থ,—সকলের জীবন যতটুকু বিস্বাদ। এ বিষয়ে তিনি নিবুপায। চামড়া যাঁর এত মোটা যে, জীবনদেবতার গায়ে হাত-বুলান আদব টেরও পান না, প্রহার ছাড়া তাঁব চলিবে কেন ?

কিন্তু ছেলে মদ টানিতেছে, এ প্রহাব নয।

কিছুক্ষণ হতভম্ব হইযা থাকিযা সেদিন তিনি হোটেল হইতে বাহির হইযা গিয়াছিলেন। যে উপাযে নিয়মিত ভাবে জীবনটা তিনি যতটুকু বিস্বাদ কবেন, কল্পনাতীত রূপে সেদিন তাব চেয়ে বিস্বাদ হইয়া গিযাছিল,—কডা এবং ঝাঁঝালো। কতকাল পরে যে এ বকম কড়া ও ঝাঁঝালো কষ্ট পাইলেন, বামলালেব মনেও ছিল না। শঙ্কব তাঁকে দেখিতে পাইযাছে কি না এ বিষযে তাঁর মনে সন্দেহ ছিল, শঙ্করেব জেলে যাওযার খববে এ সন্দেহ মিটিয়া গেল। একটু খুশিও তিনি হইলেন, তাঁকে দেখিযাছিল বলিযা নিজেব অপকীর্তিব লজ্জা এমন প্রবল হইযা উঠিযাছিল শঙ্করের যে, জেলে না গিযা সে থাকিতে পারে নাই—এ যেন একটা সান্ত্বনা, এ যেন একটা প্রমাণ যে শঙ্কব বেশি বিগডাইযা যায় নাই, এ যেন শঙ্করের পরোক্ষ ঘোষণা যে, আব কখনও এমন কাজ সে করিবে না।

কিন্তু এ সান্ত্বনা, প্রমাণ বা পবোক্ষ ঘোষণা বামলালের কাজে লাগিল না, এতকালেব ভোঁতা অনুভূতি হঠাৎ বিদ্রোহ করিয়া তাঁকে অনভ্যস্ত কষ্ট দিতে লাগিল। এ কাজ শঙ্কব করিযাছে কেন, একটি ছাড়া, এ প্রশ্নেব জবাব রামলাল খুঁজিয়া পাইলেন না। তাঁর মতো লোক যার বাপ, সে এই বকমই করে। জীবজগতের নিযমই এই। শঙ্করকে তিনি দোষ দিতে পাবেন না, জন্ম তিনি শঙ্কবকে যেমন দিযাছেন, মদেব গ্লাস হাতে করাব কামনাও তেমনই তাঁরই দান।

রামলাল নিজেও যেমন বাড়ির মানুষগুলি সম্বন্ধে নির্বিকার, বাড়িব মানুষগুলিও তাঁব সম্বন্ধে তেমনই উদাসীন। কিন্তু হঠাৎ রামলালের পবিবর্তন দেখিয়া বাড়ির লোকে অবাক হইয়া গেল। সন্ধ্যাব আগে রামলাল বাড়ি ফেরেন, এ ঘবে ও ঘরে ছটফট করিয়া বেড়ান, যাচিযা সকলেব সঙ্গে কথা বলেন, নিজের সুখসুবিধার দাবি জানান, কারণে অকারণে বাগেন আর বকেন এবং পবক্ষণে অনুতপ্ত হইয়া, বড়ো মানুষকে বকিয়া থাকিলে আদর কবেন বাড়ির কযেকটি শিশুব যে কোনো একটিকে, ছোটো মানুষকে বকিয়া থাকিলে বড়ো মানুষের যে কোনো একজনের সঙ্গে মিষ্টি কবিয়া কথা বলেন—অবান্তর খাপছাড়া সব কথা। রামলাল মদ খাইলেও টেব পাওয়া কঠিন, তবু সকলেই এখন টের পায মদ তিনি খান নাই—মদ তিনি খাইতেছেন না।

কদিনের জন্যই বা শঙ্কর জেলে গিয়াছে, তাতেই এত ? রামলালেব এমন পুত্রস্নেহেব খবব তো ইহারা রাখিত না !

সীতা বলেন, কেন এত ভাবছ দাদা ? দু-চারবছরের জেল তো হযনি !

জেলের জন্য নয় ! ওব আমি কী সর্বনাশ করেছি বল তো ?

সর্বনাশ ! কীসের সর্বনাশ ?

সে তুই বুঝবি না। মানুষের মধ্যে বংশগত প্রভাব কত জোরালো হতে পারে, তুই তার কী জানিস ?

সীতা আহতা হইয়া বলেন, আমি জানি না ? মানুষের মন সম্বন্ধে এত বই পড়ি, এত ভাবি, আমি বংশগত প্রভাবের কথা জানি না ! আমাকে মুখ্যু ভাব বুঝি তুমি ?

সীতার ভাবোচ্ছ্বাস ঠেকাইবার জন্য রামলাল তাড়াতাড়ি বলেন, আচ্ছা, আচ্ছা, তুই জানিস, সব জানিস।

সীতা বলেন, মানুষের মন কী আশ্চর্য দেখলে তো ? এই বললে জানিস না, আবার বলছ জানিস ! মানুষের মনের কথা যখন ভাবতে আরম্ভ করি দাদা—

রামলাল বিরক্ত হইয়া বলিলেন, মনে মনে ভাবতে পারিস না ? তোর মনের কথা শুনতে শুনতে মানুষের গায়ে জ্বর আসে।

শঙ্করকে পেগ টানিতে দেখিয়া রামলালের যেমন হইয়াছিল, এ কথায় সীতাও তেমনই হতভম্ব হইয়া গেলেন। মুখের চামড়া কুঁচকাইয়া কপালের স্থায়ী রেখাটি ছাড়া আরও অনেকগুলি রেখা দেখা দিল—এক মুহূর্তে সীতার যেন বার্ধক্য আসিয়াছে। চলন্ত গাড়ির বাঁক ঘুরিবার মতো অর্ধচক্রাকারে একটা পাক দিয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন, গেলেন বীরেশ্বরের কাছে। কপালের স্থায়ী রেখাটিকে বাঁহাতের আঙুলের ডগা দিয়া সজোরে ঘষিতে ঘষিতে নালিশ করিলেন। এখানে আমার তো আর থাকা হয় না বাবা !

বীরেশ্বর শান্তভাবে বলিলেন, কেন ?

কী করে থাকি ? তুমি বুড়ো হয়েছ, আজ বাদে কাল চোখ বুজবে। দাদা তখন আমায় দূর দূর করে খেদিয়ে দেবে না ?

এখনও তো চোখ বুজিনি। আগে চোখ বুজি, তারপর সে কথা ভাবিস।

তখন ভেবে কী হবে ? ভবিষ্যতের কথা আগে থেকে ভাবতে হয়। মানুষের মন কী বকম আশ্চর্য জিনিস তুমি জান না বাবা, আমার নামে কটা টাকা লিখে দিয়েছ বলে আমার কথা শুনতে দাদার এখন গায়ে জ্বর আসে। কটা টাকাই বা তুমি আমাকে দিয়েছ ? তাও দাদার সইছে না। আমি এখানে থাকব না বাবা।

বীরেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, আরও কিছু তোকে দিয়ে যাব সীতা, ভবিষ্যতের জন্য তোকে ভাবতে হবে না। এখানেই থাক তুই।

সীতাকে এখানে থাকিতে বলা বাহুল্যমাত্র, কারণ থাকিতে না বলিলেও যে তিনি এখানে থাকিবেন না, এমন কোনো প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তবে থাকিতে বলাটাই বীরেশ্বরের স্বভাব।

পরদিন সকালে তরঙ্গ আসিয়া যখন বলিল, দাদু, আপনার এখানে আমায় থাকতে দেবেন ? তখনও কেন, কী বৃত্তান্ত—কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া তাকেও তিনি থাকিতেই বলিলেন।

কৈফিয়ত দাবি করিতে গেলেন সাধনার কাছে।

সাধনা বলিলেন, আমার কোনো দোষ নেই বাবা। আমি শুধু বলেছি, এ রকম করলে আমার এখানে থাকতে পারবে না। মেয়ে অমনি হুট করে চলে গেলেন।

তাই বা কেন বললে ?

বলব না ? আমার বাড়িতে থেকে আমার ছেলেমেয়ের মাথা খাবে, আমি চুপ করে বসে থাকব ? এতকাল সয়ে এসেছি, কিন্তু মানুষের কতকাল সয় ? রাত বারোটার সময় মেয়ে গটগট করে হাওয়া খেতে বেরোবেন রাস্তায় ।

বীরেশ্বর গম্ভীর মুখে বসিয়া রহিলেন। সাধনা নতমুখে আঁচল জড়াইয়া হঠাৎ কাঁদোকাঁদো হইয়া বলিলেন, আমি চলে যেতে বলিনি বাবা, ভাবিও নি ওই কথাতে রাগ করে চলে যাবে। বাড়িটা আমার খালি হয়ে গেছে।

বীরেশ্বর গম্ভীর মুখে বাড়ি ফিরিয়া গেলেন।

জেল হইতে শঙ্কর বাড়ি ফিরিল গম্ভীর মুখেই।

তরঙ্গকে কেহ সহ্য করতে পারে না।

যে কেবল নিজের নিয়ম মানিয়া চলে, অথচ পিছনে লাগে সকলের, কে তাকে সহ্য করিতে পারিবে ? না করিবে সে সহজভাবে একটা কাজ, না বলিবে সহজভাবে একটা কথা। অনবরত নিজের অস্বাভাবিক অসাধারণত্বকে সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করিতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু এমন উদাসীন, শান্ত, সংযমের সঙ্গে কাজটা সে করিবে যে, সকলের মনে হইবে, এটা হয় তার ছেলেখেলা, নয় লীলাখেলা। বাড়ির আর পাড়ার মেয়েরা নিজেদের মধ্যে তরঙ্গের কথা বলাবলি করে। এ বিষয়ে কারও সন্দেহ থাকে না যে, পাঁচ মিনিট তরঙ্গের সঙ্গে কথা বলার চেয়ে বড়ো শাস্তি আর নাই। অথচ এমন একটা আকর্ষণ আছে তরঙ্গের পীড়াদায়ক সঙ্গের যে, দুপুরবেলা তরঙ্গের ঘরে ভিড় জমিয়া যায় পাড়ার আর বাড়ির মেয়েদের।

তরঙ্গ একাই যেন একটা যাত্রাভিনয় অথবা থিয়েটার।

আসলে এইটুকুই তরঙ্গের আকর্ষণ। সে যা বলে আর করে, তার এতটুকু দাম কারও কাছে নেই, কেন আর কীভাবে সে কোন কথাটা বলে আর কোন কাজটা করে, শুধু সেইটুকু লক্ষ করিবার জন্য সকলে গভীর কৌতূহল অনুভব করে। মেয়েদের মধ্যে বৃহত্তর মহত্তর কিছু—কিছুটা যে কী, এখনও তরঙ্গ অবশ্য নিজেই তা ভালো করিয়া বোঝে না—সঞ্চারিত করিতে চাহিয়া তরঙ্গ শুধু সঞ্চারিত করে কৌতূহল। সভয় দৃষ্টিতে সাপুড়ের সাপ নাচানো দেখিবার কৌতূহল এবং সে কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য যাত্রা-থিয়েটার দেখিতে যাওয়ার মতো প্রচণ্ড উৎসাহ !

এই উৎসাহটা তরঙ্গকে মুগ্ধ করে। সে ভাবে, ইতিমধ্যেই কি তার জীবনের উদ্দেশ্য সার্থক হইতে আরম্ভ করিয়াছে ? কী শুভক্ষণেই সে সাধনার বাড়ি ছাড়িয়া এ বাড়িতে বাস করিতে আসিয়াছিল ! কই, সেখানে তো পাড়ার মেয়েরা এমনভাবে তার কাছে আসিয়া তার কথা শুনিবার জন্য এত ব্যাকুল হয় নাই ? এখানে যে একবার তার কাছে আসিয়াছে ঘনঘন না আসিয়া সে পারে না। সে তবু কতটুকুই বা নিজেকে এখানে প্রকাশ করিয়াছে ? মেয়েদের জীবনকে নূতন ছাঁচে ঢালিবার জন্য কতটুকু চেষ্টাই বা সে করিয়াছে ?

তরঙ্গ রীতিমতো গর্ব অনুভব করে। কিন্তু নিজেই সে নিজেকে গর্ব অনুভব করিতে বারণ করিয়া দিয়াছে, তাই গর্বটাকে সে ধরিয়া লইয়াছে আনন্দ বলিয়া। যত বেশি গর্ব হয় তরঙ্গের, নিজেকে সে তত বেশি আনন্দিত মনে করে।

এ কথাটা তার মনেও থাকে না যে, আনন্দ অনুভব করাটাও তার নিজের নিয়মে নিষেধ।

কেবল তাই নয়, এ কথাটাও তরঙ্গ বুঝিতে পারে না যে, কেউ তাকে সহ্য করিতে পারে না। যাকে সহ্য হয় না, তার সঙ্গেও যে মানুষের যাচিয়া কথা বলিবার সাধ জাগা সম্ভব, এটা বুঝিবার মতো বুদ্ধি হয়তো তরঙ্গের আছে, কিন্তু বুঝিবার ইচ্ছাও নাই, চেষ্টাও নাই। চারিদিকে অজস্র সংকেত আছে যে, সে কারও প্রিয়া নয়, কিন্তু একটা সংকেত সে গ্রহণও করে না, গ্রাহ্যও করে না। মনের জোর কি সাধারণ তরঙ্গের !

দেখা গেল, শঙ্করও যেন তরঙ্গকে আর পছন্দ করিতেছে না।

প্রেমে যেন ভাটা পড়িয়া গিয়াছে শঙ্করের, জোয়ার আসিয়াছে পড়িবার নেশার। আকাশে চাঁদ থাকে, বাড়িব কোনো একটা ঘরে তরঙ্গ থাকে, অথচ শঙ্করের ঘরে অনেক রাত্রি পর্যন্ত জ্বলে আলো। কিছুই কবে না শঙ্কর,—চিরকাল যা করিয়া আসিয়াছে তার অতিরিক্ত কিছু। খায় দায় ঘুমায়, আর রাত জাগিয়া পড়ে।

দেখিয়া রামলাল স্বস্তি পান, নিশ্চিন্ত মনে আবার এখানে ওখানে পিপাসা নিবারণ কবিয়া গভীর রাত্রে বাড়ি ফিরিবাব পুরাতন প্রথাটা ফিরাইয়া আনেন, কিন্তু শঙ্করকে আর আলো নিভাইয়া শুইযা পড়িতে বলেন না !

হয়তো ভাবেন যে, তাঁর হুকুমে সাধ মিটাইয়া রাত জাগিতে পারিত না বলিযাই শঙ্কর কেবল হোটেলে গিয়া পেগ টানিয়াছিল ! জাগুক, হোটেলে যাওয়াব বদলে বাড়িতে যতখুশি রাত জাগুক।

তরঙ্গ বলে, এখন আবার এত পড়া কেন ?

শঙ্কর বলে, পড়ার আবার এখন তখন আছে না কি ?

পরীক্ষা তো নেই।

আমি পরীক্ষার জন্য পড়ি না।

তরঙ্গ মৃদু হাসিয়া বলে, সব সময় আত্মপ্রবঞ্চনা নিয়ে থাকবেন, আপনাদেব নিয়ে আমি কী যে করি !

আমাদের নিয়ে তোমার কিছু করতে হবে না।—বলিয়া শঙ্কর এমনভাবে স্থান ত্যাগ করে যে, অন্য মেয়ে হইলে রীতিমতো অপমান বোধ করিত। জটিল বোধশক্তি লইয়া তরঙ্গ যা বোধ কবে, তার কোনো সংজ্ঞা নাই।

তবে অনুপম আসিলে এবং চলিয়া গেলে তরঙ্গ যা অনুভব কবে, তাব মধ্যে অস্পষ্টতা থাকে না। অনুপমকে দেখিলে তার আনন্দ হয়, অনুপম চলিয়া গেলে হয কষ্ট। রাত্রে এখন আব অনুপমেব ঘরে আলো নিভাইবাব উপায় নাই, নিজের ঘরের আলোটা নিভাইয়া দিবাব সময বোধ হয সেই জন্যই তরঙ্গের মনে হয় অনুপমের আসিয়া চলিযা যাওয়াটা কোনো-একদিক দিযা যেন ঘবে আলোটা জ্বালিয়া নিভাইয়া দিবার শামিল।

অনুপমের জন্য চোখে অন্ধকার দেখে বলিযা অবশ্য এ কথা মনে হয় না তরঙ্গেব,—সে ভাবে চোখে অন্ধকার দেখিবার একটা সুবিধা আছে, আসল ব্যাপারটা বেশ বুঝিতে পারা যায়। অনুপমেব আসা-যাওয়ার সঙ্গে নিজের এ রকম স্পষ্ট আনন্দ ও নিরানন্দ বোধ করিবার সম্পর্কটা বুঝিবাব জন্য তরঙ্গকে নিজের মনের অন্ধকার হাতড়াইতে হয়।

সে জন্য অনুপমের কথাটা তরঙ্গ অনেক সময় ভাবে। প্রায় সর্বদাই।

অনুপমের কথা সব সময ভাবিতে সাধ হয় বলিয়া ভাবে না। ছি, ও সব দুর্বলতা তরঙ্গের নাই, সে কী আর দশটা সাধারণ মেয়ের মতো যে কিছুদিন একটা কলেজে পড়া সিগারেট-টানা আধা-কবি ছোকরার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিয়াছিল বলিয়া, রাত্রে বিছানায় শুইয়া ঘুমানোর বদলে সেই ছোকরার স্বপ্ন দেখিবে ? অনুপমের জন্য মনটা একটু কেমন করে বলিয়া, কেন অনুপমের জন্য মনটা একটু কেমন করে, শুধু এইটুকু বুঝিবার জন্য সে অনুপমের কথা ভাবে আর কোনো কারণ নাই।

এ বাড়িতে লোক অনেক। অনুপম আসিলে তার সঙ্গে একা কথা বলার সুযোগ বড়ো কম। সে জন্য তরঙ্গের রাগ হয়।

কেন রাগ হয় সেটা বুঝিবার জন্যও তরঙ্গ অনুপমের কথা ভাবে। নিজেকে না বুঝিলে তার চলিবে কেন ? জীবনের স্তরে স্তরে নিজের সাধনালব্ধ অসীম শক্তিকে সঞ্চারিত করিয়া সৃষ্টি-বিপর্যয়ের অস্থায়ী কল্যাণকর বিপ্লব আনিয়া বৃহত্তর মহত্তর জীবনের স্তর সৃষ্টি করা যার জীবনের উদ্দেশ্য, জীবনে কালবৈশাখীর মতো ভ্রান্ত ঝড়ঝাপটা আসিলেও হৃদয়মনকে নিস্তরঙ্গ করিয়া

রাখিবার ক্ষমতা অর্জন যার দিবারাত্রির তপস্যা, একজনের সঙ্গে নির্জনে আলাপ করার সুযোগ না পাওয়ায় রাগ যদি তার হয়, সে রাগের কারণ খুঁজিয়া বাহির না করিলে তার চলিবে কেন ? আর এ কারণটা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে, যার সঙ্গে আলাপ করিতে না পারায় রাগের জন্ম, তার কথাটা না ভাবিলেও বা চলিবে কেন ?

একটু উদাস মনে হয় তরঙ্গকে। একটু শিথিল মনে হয় তার জীবনযাপনের কঠোর অনমনীয় নিয়মপালন।

একটু শ্রান্ত মনে হয় তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন।

একটু উৎসুক মনে হয় তার দৃষ্টি।

এই পরিবর্তনের সঙ্গে তরঙ্গের অদ্ভুত খাপছাড়া চালচলনের উগ্রতাও কমিয়া আসে। তার ফলে তরঙ্গের মধ্যে কিছু কিছু নমনীয়তা আর কোমলতার আবির্ভাব ঘটিলেও অন্যদিকে ফলটা হয় বড়ো খারাপ। মেয়েদের কাছে তরঙ্গের সৃষ্টিছাড়া নূতনত্বের অসাধারণত্ব বড়ো তাড়াতাড়ি কমিয়া আসে। তার আনমনা ভাবটা অবশ্য একেবারে আনকোরা নতুন, কিন্তু আনমনা মেয়ের কী অভাব আছে জগতে ? যার কথা শুনিলে মনে মনে রাগ হয়, ভিতরে একটা বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণার ভাব জাগে, সংসারের দুটো সুখদুঃখের কথা বলা যার সঙ্গে অসম্ভব, তার পীড়াদায়ক সঙ্গ উপভোগ করিতে মানুষকে টানিয়া আনার মতো আকর্ষণ কারও আনমনা ভাবের থাকিতে পারে না।

পাড়ার ও বাড়ির মেয়েরা নিজেদের মধ্যে তরঙ্গের কথা বলাবলি করে কম। তরঙ্গের কাছে আসা-যাওয়াতে তাদের ভাটা পড়িয়া আসে। রাজরানির মতো রূপ লইয়া চাকরানির মতো খাটিয়া যাওয়া, ভিখারিনির মতো বিনয় লইয়া মাস্টারনির মতো উপদেশ দেওয়া, মানিবার নিয়ম না মানিয়া যত সব উদ্ভট নিয়ম মানিয়া চলা,—তরঙ্গের মধ্যে এ সমস্তের সমন্বয়ের আকর্ষণ কমিয়া আসার সঙ্গে তার সম্বন্ধে সকলের বিরাগের ভাবটাই মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে থাকে।

তরঙ্গের ঘরে দুপুরের সভাটি আর জমকালো হয় না। তরঙ্গ বিস্মিত আহত দৃষ্টিতে সভাটিকে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া আসিতে দেখে, মেয়েরা অনেকে যে তাকে এড়াইয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, এটা অনুভব করিয়া মনে তার জ্বালা ধরিয়া যায়।

কারও কাছে উপদেশ গ্রহণ না করিয়া, পথের সন্ধান না চাহিয়া নিজের অহংকারী আত্মবিশ্বাসের সাহায্যে এতদিন ধরিয়া সে যে নিজের মধ্যে সংযম জমা করিয়াছে, মনে হয় শুকনো খড়ের গাদার মতো তাতেই বুঝি আগুন ধরিয়া গেল !

একদিন সাধনা আসিয়া বলেন, ফিরে যাবি তরু ? চল না ?

না।

আমি কিন্তু তোকে তাড়িয়ে দিইনি। দিয়েছি ?

না।

তবে রাগ করে চলে এলি কেন ? ফিরে চল !

না !

না ! না ! না !—ছোটো মেয়ে হলে মেরে তোর হাড় গুঁড়ো করে দিতাম।

রাগে দুঃখে অভিমানে অপমানে সাধনার চোখে জল আসিয়া পড়িবার উপক্রম হয়। এ কী অদ্ভুত মেয়ে ! বিনা বাক্যব্যয়ে এতদিনের আশ্রয় ছাড়িয়া পরের বাড়ি চলিয়া আসিল, এতটুকু অস্বস্তি বোধ না করিয়া পরের বাড়ি জাঁকিয়া বসিয়া দিন কাটাইতে আরম্ভ করিল। ভাব দেখিয়া মনে হয়, তার বাড়িতে এতকাল সে যে বাস করিয়াছিল, কথাটা তার স্মরণ পর্যন্ত নাই।

তরঙ্গ গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকে, তার পর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, অনুদা আসে না কেন খুড়িমা ?

নানা কাজে ব্যস্ত থাকে, সময় পায় না।

কথাটা শুনিয়াই তরঙ্গ রাগে আগুন হইয়া ওঠে। মনে হয়, আজ এই রকম একটা তুচ্ছ কথায় বোমার মতো ফাটিয়া যাওয়ার জন্যই সে যেন এতকাল আত্মসংযম অভ্যাস করিয়াছে !

কাজে ব্যস্ত থাকে, না ? সময় পায় না, না ? বোলো, খুড়িমা তাকে, আমিও কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি, কোনোদিন যদি আমায় জ্বালাতে আসে, ঝেঁটিয়ে বাড়ি থেকে দূর করে দেব—যদি না দিই তো—

দুমদুম পা ফেলিয়া তরঙ্গ চলিয়া যায়। সাধনার হৃৎপিণ্ড ধড়াস ধড়াস করে। তরঙ্গকে আজ স্পষ্ট চেনা গেল। কিন্তু অনুপম ? তার ছেলে অনুপম ?

সীতা বলেন, মেয়েটা পাগল। কিন্তু কী আশ্চর্য মন মানুষের, পাগল মনে হলেও ওকে পাগল মনে হয় না।

সাধনা মুখ কালি করিয়া বাড়ি ফিরিয়া যান।

নিজের ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া তরঙ্গ শুইয়া পড়ে বিছানায়। রাগের মাথায় দুমদুম পা ফেলিয়া নিজের ঘরে আসিতে তার যে বিশেষ কিছু পরিশ্রম হইয়াছে তা নয়, তবু হাঁপানোর মতো সে জোরে জোরে নিশ্বাস টানে। উত্তেজনা শান্ত হইয়া আসিবার সঙ্গে ভিতরে মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে থাকে—এ বাড়িতে চলিয়া আসিবার আগের দিন সাধনার বাড়িতে সে যে আত্মগ্লানি অনুভব করিয়াছিল তার চেয়ে প্রবল এবং কড়া আত্মগ্লানি।

সেদিন রাত্রে খাইতে বসিলে সাধনা অনুপমকে বলিলেন, শঙ্করদের বাড়িতে বেশি আসা-যাওয়া করিস না অনু।

কেন ?

সাধনা কৈফিয়ত না দিয়া শুধু বলিলেন, কী দরকার ?

অনুপম বলিল, শঙ্করদের বাড়ি যাবার দরকার কিছু নেই তা বুঝলাম, তবু যেতে যখন বারণ করছ, কারণ তো আছে ?

সাধনা একটু ভাবিয়া বলিলেন, বড়োলোক আত্মীয়ের বাড়ি বেশি না যাওয়াই তো ভালো।

অনুপম খাওয়া বন্ধ করিয়া বলিল, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, কিছু একটা ঘটেছে, আমার কাছে চেপে যাচ্ছ। খুলে বলো তো, শুনি কী হয়েছে ? আমার কাছে গোপন না করলেও চলবে।

সাধনা বিব্রত হইয়া বলিলেন, কী আবার হবে ? কিছুই হয়নি।

শিগগির বলো মা, যতক্ষণ না বলবে হাত গুটিয়ে বসে থাকব, খাব না।

সাধনা একটু ভাবিলেন, বলিলেন, বিশেষ কিছু নয়, আজ গিয়েছিলাম তো শঙ্করদের বাড়ি—ওদের কথাবার্তা শুনে ভাবভঙ্গি দেখে কেমন মনে হল, আমরা ও বাড়িতে যাই, এটা ওরা পছন্দ করে না।

তার মানে ওরা তোমায় অপমান করেছে ?

অপমান আবার কে করবে ? ওদের চালচলন দেখে কথাটা আমার মনে হল, এইমাত্র।

এমনি ও কথা মনে হবে কেন ? নিশ্চয় তোমাকে অপমান করেছে মা, তুমি লুকোচ্ছ।

বিব্রত সাধনা এবার বিরক্ত হইয়া বলিলেন, বাবারে বাবা, তোর সঙ্গে আর পারি না অনু, একটা কথা বললে কৈফিয়ত দিতে দিতে প্রাণান্ত। অপমান করেছে তো বেশ করেছে, তোর কী ? তুই আর ওদের বাড়ি যাস না, তাতেই হবে। বকবক না করে খা তো এখন।

সুতরাং পরদিন সকালেই অনুপম শঙ্করের বাড়ি গেল। কারও সঙ্গে কথা না বলিয়া গম্ভীর মুখে সতুকে জিজ্ঞাসা করিল, তরঙ্গ কোথায় রে সতু ?

সংবাদ দিতে সতু তেমন পটু নয়। তবু অনুপম বুঝিতে পারিল যে, কাল বিকালে এক সময় তরঙ্গ নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করিয়াছিল, এখন পর্যন্ত দরজা খুলিয়া বাহিরে আসে নাই, হাজার ডাকাডাকিতেও না।

অনুপমকে বেশি ডাকিতে হইল না, তরঙ্গ দরজা খুলিয়া দিল। মুখখানা শুকাইয়া গিয়াছে তরঙ্গের, দেখিলে মনে হয় সারারাত ঘরের মধ্যে কাটানোর বদলে সে যেন এই মাত্র কড়া রোদে টো টো টহল দিয়া আসিল।

তবু একটু হাসিতে ছাড়িল না তরঙ্গ।

কী খবর অনুদা !

অনুপম বলিল, তোমার কাছেই খবর জানতে এসেছি। মাকে না কি কাল এ বাড়িতে অপমান করেছে ?

অপমান করেছে ? কে অপমান করেছে ? আমি তো কিছু জানি না !—ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমি অপমান করেছি।

তুমি ?

অবাক হয়ে গেলে দেখছি, আমি কি কাউকে অপমান করতে পারি না অনুদা ? কাল কী হল জান, আমি খুড়িমাকে জিজ্ঞেস করলাম, অনুদা আসে না কেন খুড়িমা ? খুড়িমা বললেন, কাজের ভিড়ে সময় পায় না—শুনেই আমি রেগে গেলাম।

কেন ? ও কথায় রাগের কী আছে ?

সেই তো মজা, আমিও কাল সারারাত তাই ভেবেছি। ভেবে কী আবিষ্কার করেছি, সেটা আজ আর তোমার শুনে কাজ নেই, তারপর কী হল শোনো। খুড়িমার কথা শুনে আমি রেগে বললাম, অনুদা যদি কোনোদিন এ বাড়িতে আসে ঝেঁটিয়ে অনুদাকে দূর করে দেব। তা হলেই বুঝতে পারছ, খুড়িমাকে আমি অপমান করিনি, অপমান করেছি তোমাকে। কিন্তু তুমি ছেলে কি না, অপমানটা তাই খুড়িমার বুকে বেজেছে।

অনুপম হাসিয়া বলিল, এই ব্যাপার ? কই আমাকে তো ঝেঁটিয়ে দূর করে দিলে না ?

তরঙ্গও হাসিয়া বলিল, ঝেঁটিয়ে দূর না করি, এমনি তোমায় আজ দূর করে দেব। কয়েকমাস তুমি এ বাড়িতে এস না।

কিছু বুঝতে পারছি না তরঙ্গ, সব হেঁয়ালি লাগছে।

আমি যখন মরব, তখন সব বুঝতে পারবে। তোমায় সব বুঝিয়ে একখানা চিঠি লিখে রেখে যাব।

মরব মানে ?

মরব মানে ? মরব মানে আত্মহত্যা করব। কড়িকাঠে দড়ি বেঁধে হোক, বিষ খেয়ে হোক, সটান স্বর্গে চলে যাব। মাস দুই তুমি কিন্তু এসো না অনুদা। দেখি যদি না মরে চলে।

মাস দুই। দুমাস অনুপমকে না দেখিলেই মনের অসুখটা সারাইয়া ফেলিতে পারিবে, এ রকম আশা পোষণ করা তরঙ্গের মতো অহঙ্কারী মেয়ের পক্ষে আশ্চর্য নয়। এদিকে অনুপমও বোকা নয়। দুমাসের মধ্যে কতবার সে যে তরঙ্গের সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। কিন্তু তরঙ্গ না দিল তাকে এতটুকু আমল, না বলিতে চাহিল তার সঙ্গে ভালো করিয়া কথা। তারপর একদিন নিজের ঘরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া চড়া মেজাজে এমন কড়া ধমকই সে দিল অনুপমকে যে, তারপর মাস দুই আর সে এ মুখো হইল না।

মাস দুই পরে যখন আসিল, তরঙ্গ তখন নিজের ঘরে কড়িকাঠে দড়ি বাঁধিয়া ঝুলিতেছে, পুলিশ আসিবার প্রতীক্ষায় তাকে নামানো পর্যন্ত হয় নাই। অনুপমের নামে চিঠি লিখিয়া রাখিয়া যাইতে

কিন্তু সে ভোলে নাই। অনুপমের নাম লেখা খামখানা সীতার জিম্মায় ছিল, সে কাঁদিতে কাঁদিতে খামখানা অনুপমের হাতে দিল। মোটা ভারী খাম। হাতে করিলেই বুঝা যায়, তরঙ্গ অনুপমের নামে শুধু চিঠি লিখিয়া রাখিয়া যায় নাই, মস্ত চিঠি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

## ছয়

অনুপম,

তোমার জন্য গলায় দড়ি দিয়েছি ? তোমায় ভালোবাসি বলে ? কী গভীর আনন্দই না জানি তুমি উপভোগ করছ ! কিন্তু এ জন্য বেশি অনুতাপ কোরো না, আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হোয়ো না। পার তো গোপনে একটু কাঁদাকাটা কোরো আমার জন্য। চেষ্টা করতে দোষ কী ? তবে গভীর শোকের মধ্যে, তোমার জন্য আমি মরছি ভেবে যদি গভীরতর আনন্দ উপভোগ কর, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নিজের মনকে বিশ্লেষণ করতে বোসো। আমার তো মনে হয় যে কোনো জার্মান মনস্তত্ত্ববিদের যে কোনো একখানা বই খুলে আত্মপরীক্ষায় বসলেই ফুল মার্কস পাবে। তোমার বোকামির প্রতিভা আছে।

গলায় দড়ি দেওয়া ভালো নয়। তবু অনেকেই গলায় দড়ি দেয়। গলায় দড়ি দেবে, কি দেবে না ভাবতে ভাবতে অন্যমনে কখন যে গলায় দড়ি দিয়ে বসে টেরও পায় না। টের পায় না মানে—মানে তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ—গলায় দড়ি দিলে আর কি করে টের পাবে ? কিন্তু তোমার জ্বালায় আর দশজনের মতো স্বাভাবিকভাবে গলায় দড়ি পর্যন্ত আমার দেওয়া হল না। তুমি আমার শনিগ্রহ, মরবার আগে এত লোক থাকতে তোমার উপরেই রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে। আমি গলায় দড়ি দেব আর তুমি ভাববে তোমার জন্য আমার হৃদয়ে প্রেমের ক্যান্সার হয়েছিল, যাতনা সহ্য করতে না পেরে কয়েক হাত লম্বা একটা দড়ি ধরেই স্বর্গে চলে গেলাম—এ কথা ভাবছি আর সাধ হচ্ছে আগে তোমাকে খুন করে তারপর নিজের যা হয় ব্যবস্থা করি। আমাকে নিয়ে অনেক আলোচনা, অনেক গবেষণা চলবে জানি, অনেকে অনেক রকম থিয়োরি বার করবে, কিন্তু আমি তা গ্রাহ্যও করি না। যার যা খুশি ভাবুক, যা খুশি কল্পনা করুক—কিন্তু এ জগতে একজনও যদি বিশ্বাস করে যে, প্রেমের জন্য তরঙ্গ গলায় দড়ি দিয়েছে, গলায় দড়ি দিয়ে তবে তরঙ্গের লাভ কী ?

তুমি আমাকে অনেকদিন থেকে ঘনিষ্ঠভাবে জান, অন্তত তোমার বোঝা উচিত প্রেমের জন্য বুকভরা যেন্না পোষণ করা ছাড়া তরঙ্গের পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব নয় অথচ তুমিই বিশ্বাস করবে, তরঙ্গ আত্মহত্যা করেছে প্রেমের জন্য ! তুমি এত বড়ো হাঁদা।

এত লোক থাকতে এই জন্যই তোমার নামে এত বড়ো একখানা চিঠি আমাকে লিখে রেখে যেতে হল। চিঠিখানা ঠিক কত বড়ো হবে এখন অবশ্য আমি তা জানি না, কিন্তু মস্ত বড়োই যে হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ধৈর্য ধরে শেষ পর্যন্ত পোড়ো। তোমার মতো বোকা হাবাকে, কী জন্য গলায় দড়ি দিলাম, দু-চার কথায় বোঝানো আমার কর্ম নয়। ভুল বোঝার পাথরে শাণ দিতে দিতে তোমার বুদ্ধির তরোয়ালের ধারালো দিকটা এমন ভোঁতা হয়ে গিয়েছে যে, ভোঁতা দিকটার ধার বেশি হওয়ায় বুদ্ধিকে তোমার উলটোভাবে ব্যবহার না করে উপায় নাই।

রাগ করলে ? রাগ কোরো না। যেমন বুদ্ধিই হোক তোমার বুদ্ধি আছে এইটুকু যে স্বীকার করে নিয়েছি তাই খুব বড়ো প্রশংসা বলে ধরে নিয়ো। কে জানে, হয়তো তোমাকে একটু মায়া করি বলেই তোমাকে বুদ্ধিমান মনে করতে ইচ্ছা হচ্ছে। মমতাই মানুষের সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা।

অনুপম, মায়ামমতার নামেই মেয়েদের মনটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে, আর ওঠে মেয়েছেলেদের মন, যারা ছেলে, কিন্তু পুরুষ নয়। তোমার মনটা যদি আমার এই মায়া করার কথায় ছ্যাঁৎ করে ওঠে, একটা সিগারেট ধরিয়ে নিজের গায়ে একটা ছ্যাঁকা দিয়ো। এ মায়ামমতা প্রেম নয়। তরঙ্গ প্রেমের ধার ধারে না।

তোমার কাছে এ কথা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই, কী করে যে কী হল, আমি ভালো বুঝতে পারছি না। কেবল এটুকু বুঝতে পারছি, অনেক যত্নে যে তাসের ঘর রচনা করেছিলাম, আমার নিজের নিশ্বাসে হুড়মুড় করে সে ঘর ভেঙে গিয়েছে। আমি এমন সৃষ্টিছাড়া কালনাগিনী যে, নিজের লেজ কামড়ে নিজের মাথার বিষে নিজেই আমি মরে গেলাম। বিষটা মাথায় থাকলে হয়তো বাঁচতাম, অমন অনেকেই বেঁচে আছে, বিষটা তাদের কাছে অমৃতের সমান, কারণ, ওই বিষ দিয়ে অপরকে মেরে ফেলা যায়—এই হিংসার যুগে এত বড়ো পরিতৃপ্তি যা দিতে পারে সে বিষ অমৃত বইকী! কিন্তু আমার মাথাটা খারাপ কিনা, নিজের বিষদাঁত তাই নিজের উপরেই ব্যবহার করে নূতন একস্‌পেরিমেন্ট করতে গেলাম।

তুমি জান আমার জীবনটা কী রকম খাপছাড়া। আমি নিজে খাপছাড়া মানুষ বলে আমার জীবনটা খাপছাড়া হয়েছে অথবা আমার জীবনটা খাপছাড়া বলে আমি খাপছাড়া হয়েছি, এ সব ধাঁধা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। এ সব হল আমার নিজস্ব ধাঁধা। আমার ধাঁধা আমারই থাক, সময়মতো দড়ির ফাঁসে আচ্ছা করে বাঁধব। তোমার প্রেম ছাড়া আমার গলায় দড়ি দেওয়ার আর কী কারণ থাকতে পারে—এ ধাঁধাটা তোমার। তোমার ধাঁধাটার জবাব শুধু আমি দিয়ে যাব।

আমি জবাব দিয়ে না গেলে তুমি নিজে নিজে যে জবাবটা ঠিক করে নেবে, মরে গেলেও আমার তা সহ্য হবে না অনুপম।

বাবা মোটা মোটা বই পড়তেন, মোটা মোটা কথা বলতেন। বইয়ের কথা কলেজের ছেলেদের বলার জন্য পারিশ্রমিকও পেতেন মোটা। মেজাজটাও বাবার ছিল তাই গরম। চোখে হাই পাওয়ারের চশমা লাগিয়ে বাবা যখন হাইস্পিডে সমাজ, ধর্ম, সভ্যতা, জীবন, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসের তত্ত্বকথা আমার ভবিষ্যৎ স্বামীকে শোনাতে শোনাতে রেগে আগুন হয়ে উঠতেন, আর আমার ভবিষ্যৎ স্বামী ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, জীবন, সভ্যতা, ধর্ম, সমাজের তত্ত্বকথা বাবাকে শোনাতে শোনাতে খেপে যেতেন, তখন দুজনকে দেখেই আমি হয়ে যেতাম মুগ্ধ। বাবার জন্য অনুভব করতাম গভীর শ্রদ্ধা, ভবিষ্যৎ স্বামীর জন্য অনুভব করতাম গভীর প্রেম। না, প্রেম বলতে তুমি যা বোঝ, সে প্রেম নয়। আমার বাবা অথবা আমার ভবিষ্যৎ স্বামী দুজনের একজনও, প্রেম বলতে তুমি যা বোঝ, সে প্রেমে বিশ্বাস করতেন না। প্রেম সম্বন্ধে বাবার মত ছিল, সাতজন জার্মান প্রেম-বিশেষজ্ঞের মতো বাতিল করা নূতন একটা মত, আর স্বামীর মত ছিল ওই সাতজন জার্মান ভদ্রলোকের মতকে স্বদেশি ছাঁচে ঢেলে নিলে যা দাঁড়ায়, তাই। অর্থাৎ অনুবাদ নয়, মর্মানুবাদ। এই জন্য ভবিষ্যৎ স্বামীর মতটাই আমার বেশি ভালো লাগত।

কেবল প্রেম নয়, সব বিষয়েই আমার ভবিষ্যৎ স্বামীর এ রকম মর্মানুবাদের আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। আসলে, এই জন্যই সে মহাত্মাকে আমি আমার স্বামী হবার অধিকার দিয়েছিলাম।

নতুবা তরঙ্গ হেন মেয়ে, জগতে আর জোড়া নেই, পৃথিবীব আর সব মেয়ে বক হলে যাকে কেবল হংসী নয়, রাজহংসী বলা ছাড়া উপায় থাকে না, সেই তরঙ্গের স্বামী কি যে কেউ হতে পারে, ও রকম মহাপুরুষ ছাড়া ?

হে সিগারেটপায়ী অভিমানী বালক অনুপম, কোথায় লাগো তুমি আমার সেই স্বামীর কাছে ! তার তুলনায় তুমি কীটাণুকীট। তুমি হলে খবরের কাগজে নিউজ ট্রানস্লেটরের ইংরেজি খবরের ট্রানস্লেশন, আমার তিনি ছিলেন গল্পে কবিতায় সাহিত্যিকের ইংরেজি সাহিত্যের মর্মানুবাদ। রূপকটা বুঝতে পারলে ? আর একটু পরিষ্কার করেই বুঝিয়ে দিচ্ছি। তখন আমি খাঁটি ভারতীয় প্রথায় খাঁটি বিলাতি ফিল্‌মের স্টারদের মতো হাসতে পারতাম বলে তিনি আমার প্রেমে পড়েছিলেন, আর তুমি আমার প্রেমে পড়লে আমি যখন খাঁটি বিলাতি প্রথায় দেশি ফিল্‌মের স্টারদের মতো হাসতে শিখেছি।

বাড়িয়ে বলিনি। ভবিষ্যৎ স্বামীর জন্মদিনে ভবিষ্যৎ স্বামী আমায় বললেন, জন্মদিনে একটা প্রেজেন্ট চাই তরঙ্গ।

আমি বললাম, কী চাই ? মোটে তো বেজেছে নটা, আমি নিজে গিয়ে কিনে নিয়ে আসব।

তিনি বললেন, ও সব প্রেজেন্ট নয়। আমার সঙ্গে একা সিনেমায় যেতে হবে।

আমি বললাম, চলুন।

তিনি বললেন, তোমার বাবাকে বলো।

আমি মুচকে হেসে বললাম, বাবাকে আবার কী বলব ? আমার তেমন বাবা নন যে, খারাপ লোকের সঙ্গে সাড়ে নটার শোতে সিনেমায় গিয়ে নিজের ভালোত্ব বজায় রাখতে পারব না ভেবে ছটফট করবেন। জানেন, আমি বাবার হাতের মানুষ করা তরঙ্গ ?

সিনেমা দেখিয়ে মাঠে নিয়ে গিয়ে তিনি প্রোপোজ করলেন। বললেন, আমার হাসি অমুকের মতো, কাশি অমুকের মতো, চোখ অমুকের মতো, মুখ অমুকের মতো, কথা অমুকের মতো, চলন অমুকের মতো। অমুকরা সবাই ফিল্মস্টার নয় বলে নাম করলাম না।

তারপর তুমি কবে আমার কাছে প্রথম বিহ্বল হয়েছিলে মনে আছে ? আমাকে দেশি ফিল্ম দেখিয়ে যেদিন বাড়ি ফিরতে চাওনি, শহরতলিতে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলে। তুমিও সেদিন গদগদ হয়ে বলেছিলে, আমি নাকি অনেকটা অমুকের মতো।

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোমার অমুকটির ফি কত করে ?

তাতে কী গভীর আঘাতই তোমার লেগেছিল।

একবার গঙ্গার ঘাটে ছোটো একটা ছেলে জলে ডুবে মরবার আবদার ধরায় তার মাকে তার গালে চড় মারতে দেখেছিলাম। ছেলেটা যেভাবে ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে উঠবার উপক্রম করেও কাঁদেনি, ভাবপ্রবণতায় ডুবে মরতে গিয়ে আমার কথার মার খেয়ে তুমিও সেদিন তেমনই মুখভঙ্গি করেছিলে।

আজ আমার কেবলই মনে হচ্ছে, আমি গলায় দড়ি দিয়েছি শুনে তুমি নিশ্চয়ই সেই রকম মুখভঙ্গি করবে।

যদি একবার দেখতে পেতাম !—

মনে কোরো না যে, দেখতে পেলেও কৌতূহল নিবৃত্তি ছাড়া আমার আর কোনো লাভ হত। রোমান্টিসিজমের মিথ্যা মানস সরোবরে ডুবতে না দিলেই যে তোমার মহা উপকার সাধন করা হবে, সে ভুল ধারণা আমার ভেঙে গেছে। ও রকম ডুবে মরবার সঙ্গে বিয়ালিজমের কঠিন পাথরে মাথা ঠুকে ঠুকে মরার তফাত আছে, কিন্তু দুটোই অপমৃত্যু। আমার গলায় দড়ি দিয়ে মরা আর দুদিন পরে তোমার টিবি হয়ে রক্তবমি করতে করতে মরার মধ্যে কত তফাত—অথচ দুটোই কী শোচনীয় অপমৃত্যু ! আমি গলায় দড়ি দিয়েছি শুনে তুমি প্রচণ্ড একটা আঘাত পাবে, সে আঘাতে অসার অর্থহীন অবাস্তব কল্পনার জগৎ থেকে তুমি অন্তত কিছুদিনের জন্য মাটির পৃথিবীতে নেমে আসবে—আগে এ কল্পনায় আমার আনন্দ জাগত, চড়-খাওয়া ছেলের মতো তোমার মুখভঙ্গি দেখে আমার লাভ হত এই যে, মনে ভাবতাম এ জগতে অন্তত একজনের একটু কাজে লেগেছি, আর দশজনের মতো আগাগোড়া ব্যর্থ জীবন আমার নয় !

কিন্তু আজ আমি বুঝতে পারছি, ও ভাবে তোমাকে মাটির পৃথিবীতে নামিয়ে আনার কোনো দাম নেই, আনবার অধিকার আমার নেই। তোমাকে বাঁচবার পথ আমি দেখাতে পারব না। আমি নিজেই সে পথ জানি না। আমি নিজে দুর্ভেদ্য অন্ধকারে হাতড়ে ফিরছি, তোমাকে আমি কী করে বলব ওই কাব্যের ঝংকারময় ফুল-বিছানো পথ ধরে যেয়ো না, এই কার্যের কোলাহলময় বন্ধুর পথ ধরে এসো, এই পথে জীবনের সার্থকতা ? কোনটা কাব্যের ঝংকার, কোনটা কার্যের কোলাহল, কোনটা ফুল, কোনটা পাথর, কোনটা বিপথ, কোনটা জীবনের সার্থকতা, কোনটা ব্যর্থতা, এ সব

আমার কাছে গোলমাল হয়ে গেছে—মানুষ কী, মানুষ মানুষ কেন, জীবনে মানুষ কী চায়, আর কেন চায়, কী পায়, আর কেন পায়, কী চাওয়া উচিত, আর কেন চাওয়া উচিত, এ সব এমন উদ্ভট সমস্যায় পরিণত হয়ে গেছে যে, আমি বুঝতেও পারছি না, এগুলি সত্যই সমস্যা না আমার মাথার মধ্যে এমন কোনো পাগলামি বাসা বেঁধেছে, যার জন্য সহজ সোজা কথাগুলিকে বিকৃত করে দেখছি ! অথচ কিছুদিন আগেও আমি ভাবতাম জীবনের অনেকগুলি ধাঁধার জবাব আবিষ্কার করেছি, আর কিছুদিন চেষ্টা করলে বাকিগুলিও আবিষ্কার করে ফেলতে পারব। কিছুদিন আগে আমার মনে যখন আমার ক্ষমতা সম্বন্ধে প্রথম সন্দেহ জাগে, তখনও কী রকম অদ্ভুত কথা সব ভাবতাম শোনো। ভাবতাম, জীবনকে ধাঁধা না জেনে ধাঁধাগুলি সত্যই জীবনের, না পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ধাঁধা সে হিসাব না করে, ধাঁধার জবাব আবিষ্কাব করার মতো এই বিস্ময়কর প্রতিভা নিয়েই কি আমি জন্মেছি ? আমার রক্তের মধ্যেই কি এই অসাধারণ ক্ষমতা মিশে ছিল ? অথবা আমি জন্মে থেকে যে শিক্ষাদীক্ষা পেয়ে মানুষ হয়েছি, তাই আমাকে এমন অসম্ভব রকমের ক্ষণজন্মা নারীতে পবিণত করেছে ?

আজ কিন্তু নিজেকে হাজারবার প্রশ্ন কবে একটা অতি সহজ ধাঁধারও জবাব পাই না অনুপম। কিছুকাল ধরে একটা জিজ্ঞাসা আমার মনকে লাঙলের মতো চষে বেড়াচ্ছে। অথচ কারও কাছে এ জিজ্ঞাসার জবাব পাবাব ভরসা আমার নেই। আমি কী ভাবছি জান ? ভাবছি, যে পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে যে রকম শিক্ষাদীক্ষা পেয়ে আমি বড়ো হয়েছি, সে সব তো সৃষ্টিছাড়া নয়, অনেকেই তো ও রকম অবস্থায় ও বকমভাবে মানুষ হয়, তবে কেবল আমার বেলাতেই এ রকম অঘটন ঘটল কেন ? আমি কেন এমন সব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলাম আমার যা আয়ত্তের বাইরে, বুদ্ধির অগম্য, সাধ্যের অতীত ? কেন আজ আমার মানসিক অবস্থার এমন বিপর্যয় ঘটল যে, পৃথিবীতে নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পেরে নিজেকে আমার মেরে ফেলতে হচ্ছে ?

অনুপম, তোমাকে এই কথাগুলি লিখতে লিখতে আমার বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করছে। সত্যই কি আমি এ রকম হয়ে গেছি ? খানিক আগে নিজেকে আমি যে খাপছাড়া বলেছি, সত্যই কি আমি তাই ?

যে সব কারণ আমাকে এ বকম কবেছে, হয়তো আরও অনেককে সেই সব কাবণেই আমার মতো করে তুলেছে ? তাদের সঙ্গে আমাব পার্থক্য হয়তো কেবল তুচ্ছ খুঁটিনাটিব—সমস্ত মানুষের মূর্তি একরকম হলেও প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের সর্বাঙ্গীণ পার্থক্য থাকে, সেইবকম একটা স্বাতন্ত্র্য ? অনুপম, কে জানে হযতো আমাব গলায় দড়ি দেবার আসল কারণ যা, আজ পর্যন্ত আরও অনেকের গলায় দড়ি দেবার কাবণও তাই ছিল ? হয়তো যে শক্তি আমাকে আত্মহত্যার প্রবৃত্তি দিয়েছে, সেই শক্তি তাদেরও আত্মহত্যাব প্রেবণা জুগিয়েছিল—আমরাই কেবল ধরতে পারছি না, সেই শক্তিটার স্বরূপ কী এবং কীভাবে, কখন, কোথায কীসের ছদ্মবেশে সে কাজ করে ?

আমি তোমাদের বাড়িতে থাকবার সময় পাড়ার ভূদেববাবুদের বাড়িতে একটা ছেলে পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে মরেছিল। তুমি আমায় এসে বলেছিলে, ছেলেটার কুৎসিত রোগ হয়েছিল বলে সুইসাইড করেছে তরঙ্গ। ভালোই করেছে। ও রকম ছেলের মরাই ভালো।

আমি মুচকে হেসে বলেছিলাম, হয়তো তা নয় অনুদা, হয়তো ক-বছর ধরে পবের অন্নজল পেটে দিয়ে দিয়ে আর ভালো না লাগায় মুখ বদলাতে স্বর্গে গেছে। কুৎসিত রোগ আবার কীসের ? দেখতে, উপার্জনের উপায় থাকলে কুৎসিত রোগ নিয়েই বিয়ে-থা করে ছোঁড়া দিবি সংসার করত।

আরও কী যেন সব তোমায় বলেছিলাম। অনুপম, হয়তো সেই ছেলেটা যে জন্য আত্মহত্যা করেছিল, আমিও সেই জন্যই আত্মহত্যা করতে যাচ্ছি ? আমার কুৎসিত রোগ নেই, পরের অন্নজল আমায় পেটে দিতে হয় না, কিন্তু আমি ভাবছি কী জান, সংসারে আমি তো একা নই, দশজনের

মধ্যে আমার বাস, পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব আর দশজনের মধ্যে যেভাবে কাজ করে, আমার মধ্যেও তেমনইভাবে কাজ করে। এ হিসাবে ধরলে জগতের সমস্ত মানুষের ভাগ্য পরস্পরের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত ; জগতের কোথাও একটিমাত্র মানুষ যদি না খেতে পেয়ে আত্মহত্যা করে সেটাকে আমরা বিভিন্ন স্বতন্ত্র ঘটনা বলে গ্রহণ করতে পারি না, তার আত্মহত্যার কারণ সমগ্র জগতে নানারকম রূপ নিয়ে ছড়িয়ে থাকবেই থাকবে। তাই যদি হয় অনুপম, তা হলে হয়তো ভূদেববাবুর বাড়ির ওই বেকার ছেলেটার জীবনে তার জন্ম থেকে,---হয়তো তার জন্মের অনেক যুগ আগে থেকেই যে সব কার্যকারণের সমাবেশ শেষ পর্যন্ত তার আত্মহত্যায় পরিণতি লাভ করেছিল--- আমার জীবনেও সেই কার্যকারণগুলির সমাবেশ আমাকেও আত্মঘাতিনী করাতে চলেছে ? কিন্তু কোথায় এই যোগসূত্র ? সেই ছেলেটার জীবনের সঙ্গে আমার জীবনের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সমস্ত পৃথিবীর নরনারী পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ বৃক্ষলতা জলবায়ু মাটি—এমনকী, হয়তো সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও—মধ্যস্থতায় প্রকৃতির নিয়মে স্থাপিত হয়ে আছে, কী তার স্বরূপ ? আমি তো তা জানি না অনুপম ! তোমাকে এই কথা কটা লিখতে গিয়েই আমার মাথা ঝিমঝিম করছে। আমার সে বুদ্ধি কই যা দিয়ে আমি এই যোগসূত্রের মূলতত্ত্ব জানব ? জানি না বলেই মনটা আমার খুঁতখুঁত করছে যে, হয়তো যা ভেবে আমি গলায় দড়ি দিতে চলেছি, তাও ভুল—কী যে ভুল নয়, আমার তা বুঝবারও ক্ষমতা নেই। আছে ?

তবে কী জান অনুপম, বেঁচে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব, এইটুকু সান্ত্বনা আমাব আছে। যে সব কারণে গলায় দড়ি দেওয়া আমি উচিত মনে করেছি, তার সবগুলি ভুল হলেও এ কথাটা সত্য যে, তোমাদের মধ্যে তোমাদের সঙ্গে বেঁচে থাকার মতো শিক্ষা আমাকে কেউ দেয়নি, আমাকে মরতেই হবে।

এতদিন সংস্কারেব ও সংশোধনের কল্পনা নিয়ে চারিদিকে তাকাতাম, তাই যা দেখতাম তা সহ্য হত, সাময়িক বলে অনেক কিছু স্বীকার করে নিতাম, ভাবতাম আমি যেটুকু দেখছি, সংসারে তার চেয়ে খুব বেশি শ্রী ও সামঞ্জস্যের অভাব থাকা সম্ভব নয়, মানুষ আসলে মানুষই আছে, বাঁচবার নিয়মও মানুষ মোটামুটি জানে,·কেবল নিজের বোকামির দোষে মানুষ কিছু মনুষ্যত্ব হারিয়ে পেয়েছে কিছু পাশবিকতা, আর বাঁচবার কয়েকটা নিয়ম পালন করতে ভুল করে জীবনে এনেছে কিছু গন্ডগোল।

ও মা, শেষে দেখলাম ভুলটা আমারই !

সকলের জীবনেই আজ অন্যায় বেশি, অভাব বেশি, অপবাধ বেশি, অনাচার বেশি, বিশৃঙ্খলা বেশি। মানুষ যদি সজ্ঞানে জীবনে এ সব সঞ্চয় করত, তারও একটা মানে বোঝা যেত, না জেনে না বুঝে মানুষ নিজের জীবনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, মহা আড়ম্বরের সঙ্গে করছে নিজের সর্বনাশ। অন্ধ পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে অন্ধকে। যারা এ রকম করছে তারাই আবার দশজনকে উপদেশ দিচ্ছে, এই করো, ওই করো, তাই করো। কী অবস্থায় আজ আমরা এসে পড়েছি জান অনুপম ? জীবনকে যে সুন্দর করতে চায়, নিখুঁত করতে চায়, পরিপূর্ণ করতে চায়, তার সমস্ত চেষ্টা পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে—জীবনে সার্থকতা লাভের পথটিও খুঁজে পাচ্ছে না, তার নিজের ভিতরের আর বাইরের অসংখ্য বিরুদ্ধশক্তি ঘাড় ধরে তাকে বিপথে ঠেলে নিয়ে গেলে বাধাও সে দিতে পারছে না।

যেমন আমি।

কী শিক্ষাই আমার বাবা আর আমার স্বামী আমাকে দিলেন। জ্ঞানের আলো জ্বলে উঠল আলেয়ার মতো, না লাগল সে আলো জগতের কারও কাজে, না লাগল আমার নিজের কোনো উপকারে। বিপথে বিপথে ঘুরিয়ে, শেষ পর্যন্ত আমাকেই টেনে নিয়ে চলল অপমৃত্যুর দিকে।

তরঙ্গের চিঠিখানা অসমাপ্ত।

বেশ বোঝা যায়, তরঙ্গ আরও অনেক কথা লিখিয়াছিল, কিন্তু কে যেন চিঠির বাকি অংশ ছিঁড়িয়া লইয়াছে। খামটি খোলা ছিল, কী বন্ধ ছিল, প্রথমে অনুপম লক্ষ করে নাই। এবাব খামখানা একটু ভালো করিয়া দেখিয়াই সে বুঝিতে পাবিল, কে যেন অপটু হাতে জল দিয়া ভিজাইয়া খামটি খুলিয়াছিল, তারপর একান্ত অবহেলার সঙ্গে আবার বন্ধ করিয়াছে।

সীতা স্বীকার করিলেন, হ্যাঁ, আমি খুলেছিলাম চিঠিটা। কিছু মনে করছ না তো ? কদিনে যা ভালোবেসেছিলাম মেয়েটাকে অনু, না খুলে থাকতে পারলাম না।

অনুপম বলিল, চিঠির শেষটা কোথায় গেল ?

সীতা নির্বিবাদে বলিলেন, আমি ছিঁড়ে নিয়েছি।

কেন ?

মরবার সময় ঝোঁকের মাথায় একটা মেয়ে যা-তা লিখে বেখে গেছে, সকলকে কী তাই পড়তে দেওয়া যায় ? তুমিই বল, যায় ?

কিন্তু লিখে তো গিযেছিল আমাকে ? আমার চিঠি আপনি খুলে পড়লেন, আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করাও দরকার মনে করলেন না ! তারপব আবাব চিঠির অর্ধেকটা রেখে দিলেন ছিঁড়ে ! নিয়ে আসুন, কোথায় বেখেছেন।

সীতা নির্বিবাদে বলিলেন, সে কি আর আছে ? সে আমি পুড়িযে ফেলেছি।

তরঙ্গের মৃত্যুর আঘাতটাই খিলেব মতো এতক্ষণ অনুপমের মনের বাগটাকে আটকাইয়া রাখিয়াছিল, এবার সে যেন রাগে দিশেহারা হইয়া গেল। ক্রোধের বশে মানুষ খুন করিবার আগে খুনি যেভাবে তাকায, তেমন দৃষ্টিতে সীতা পিসিমার দিকে চাহিযা সে বলিল, পুড়িয়ে ফেলেছেন ? ইযার্কি পেযেছেন না কি আপনি, আঁা ?

সীতা যে গুরুজন সে কথা ভুলিয়া একটা বিশ্রী গালও অনুপমের জিভের ডগায় আসিয়াছিল, কত কষ্টেই সে গালটা সে চাপিয়া রাখিল !

সীতা পিসিমার আজ ভাবান্তর আসিয়াছে। আজ যেন তিনি শান্ত, সহিষ্ণু, বুদ্ধিমতী মহিলা— কথায ব্যবহারে কোনো রকম পাগলামি নাই, বরং তরঙ্গের চিঠির শেষাংশ ছিঁড়িয়া লওয়াব জন্য অনুপম যে রাগারাগি করার মতো ছেলেমানুষি পাগলামি আরম্ভ কবিবে, অনেকদিন আগে হইতে, তরঙ্গের গলায় দড়ি দেওযারও আগে হইতে, তিনি যেন তাহা জানিতেন এবং অনুপমকে সামলাইবার ভারটাও তখন হইতেই তিনি যেন গ্রহণ করিয়া রাখিয়াছেন। ধীর স্থিব গম্ভীর গলায বলিলেন, ছেলেমানুষি কোরো না, অনুপম। তরঙ্গ চিঠিখানা আমার জিম্মায় রেখে গিয়েছিল, ইচ্ছে করলে সমস্ত চিঠিটাই তো আমি তোমাকে না দিয়ে পুড়িযে ফেলতে পারতাম ? তাই ইচ্ছে ছিল আমার, নেহাত তরঙ্গের শেষ কথাটা একেবারে ঠেলতে পারলাম না বলে অর্ধেকটা তোমায় দিযেছি। হ্যাঁ অনুপম, তরঙ্গ যে এ ভাবে আমাদের ছেড়ে গেল, তার চেয়ে তরঙ্গের চিঠির খানিকটা পড়তে পারলে না, এটাই কি তোমাব কাছে বড়ো হল ?

অনুপম ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, এমনিভাবে ছেড়ে গেল বলেই তো চিঠিব সবটা পড়বাব জন্য ব্যাকুল হয়েছি। কী লিখেছিল বাকিটাতে ?

সে তোমার জেনে কাজ নেই।

সীতাকে কোনোমতেই বলানো গেল না। পেটে কথা রাখা সীতার পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু অনুপমকে চিঠির বাকি অংশে তরঙ্গ যে সব কথা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, সেই কথাগুলি তিনি বোধ হয় একেবারে বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন, ঘুণাক্ষরেও কেহ জানিতে পারিল না।

কেবল এইটুকু জানা গেল, তরঙ্গের বাকি কথাগুলি ভালো নয়। নিজেকে আর জগৎসুদ্ধ মানুষকে সে বড়ো খারাপভাবে গালাগালি দিয়াছে। নিজের সম্বন্ধেও এমন কতকগুলি কথা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে যে—

কী সেই কথাগুলি ?

আমি তা বলতে পারব না বাবু।

তরঙ্গের প্রকৃতি যে স্বাভাবিক ছিল না, সীতা দয়া করিয়া অনুপমকে তার চিঠির যেটুকু অংশ দিয়াছিলেন, সেটুকু পড়িলেই তা বেশ বোঝা যায়। আরও অনেকের মাথাও যেন তরঙ্গ কমবেশি খারাপ করিয়া দিয়া গেল। সকলের জীবনে এমন একটা সমস্যা, এমন একটা রহস্য, এমন একটা অভূতপূর্ব প্রভাব সে বিস্তার করিয়াছিল যে, সকলের মনের তলে তলে তার নাটকীয় আত্মলোপের আঘাতটা যেন—তার কথা ভুলিয়া থাকিবার সময়ও—চোরের মতো সিঁদ কাটিয়া বেড়াইতে লাগিল, সুখশান্তি যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে কারও মনে, অপহরণ করিবে।

অন্য কারও মনে সুখশান্তি থাক বা নাই থাক, অনুপমের মনে অশান্তি ছাড়া আর কিছুই রহিল না। কী লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিল তরঙ্গ ? যে ধাঁধা তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে, তার কি মীমাংসা সে নিজেই করিয়া দিয়া গিয়াছিল, সীতা পিসিমা যাহা আগুনে সঁপিয়া দিয়াছেন ? ক্রমে ক্রমে সীতা পিসিমার কথাই যেন সত্য হইয়া দাঁড়ায়, তরঙ্গ যে এ ভাবে তাহাদের ছাড়িয়া গিয়াছে, তার চেয়ে তরঙ্গের শেষ চিঠির শেষটা যে সে পড়িতে পারিল না, এটাই অনুপমের কাছে বড়ো হইয়া উঠে। সীতা পিসিমার কাছে সে মিনতি করে, রাগারাগি করে, ভয় দেখায়, আবোল-তাবোল বকে—কিন্তু দেখা যায়, সীতা এ বিষয়ে বড়ো শক্ত।

না আমি বলব না। কেন এ রকম করছ অনুপম ?

সবটা না হয়, আভাসে একটু বলুন ?

তাও বলব না।

শঙ্কর কয়েকদিন ঝিমাইল। তরঙ্গ অনুপমকে চিঠি লিখিয়া গিয়াছে দেখিয়া হঠাৎ শঙ্করের মনে প্রবল আঘাত লাগিয়াছে, তরঙ্গকে কিছুদিন হইতে তার ভালো লাগিতেছিল না—তবু সে থাকিতে অনুপমকে চিঠি কেন ? তবে কী অনুপমের জন্যই তরঙ্গ তাকে অপমান করিয়াছিল ? সে থাকিতে অনুপমকে যখন চিঠি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে, তখন আর কী অর্থ হয় তরঙ্গের ব্যবহারের ?

মনটা যখন শঙ্করের এই সব কথা ভাবিয়া অত্যন্ত খারাপ, একদিন লীলাময় ব্যস্তসমস্তভাবে আসিয়া বলিলেন, টাকা আছে শঙ্কর ? মিসেস সেন কিছু টাকা চাচ্ছেন।

মিসেস সেন কোথায় ?

সেইখানে। তোমাকেও যেতে বললেন।

কত টাকা চাচ্ছেন ?

এমনভাবে শঙ্কর কথাটা জিজ্ঞাসা করিল, যেন টাকার ভান্ডার তাহার অফুরন্ত, যত চাও ততই পাইবে।

লীলাময় একগাল হাসিয়া বলিলেন, কিছু বেশি করে নিয়ে যেতে বললেন, বললেন, বড্ড দরকার, সাত দিনের মধ্যে ফিরিয়ে দেবেন।

সেই হোটেলের সেই ঘরে সেই আবহাওয়া সেই রকম আনন্দোচ্ছল মিসেস সেন বন্ধুবান্ধবকে আমোদ জোগাইতেছিলেন। লীলাময়ের চোখের ইশারায় একটু আড়ালে আসিলেন।

শঙ্কর স্পষ্ট ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল, কত টাকা চাই ?

মিসেস সেন মধুর হাসিয়া বলিলেন, দরকার তো ছিল অনেক টাকার, তুমি কত দিতে পার তাই বলো না !

একশো।

মোটে ? আচ্ছা তাই দাও।

শঙ্কর বলিল, আজ তো সঙ্গে নেই। কাল দেব।

কাল কখন ?

শ্রদ্ধানন্দ পার্কে একটা মিটিং আছে না কাল—আপনিও তো লেকচার দেবেন দেখলাম খবরের কাগজে—দেবেন না ?

মিসেস সেন মাথা হেলাইয়া সম্মতি জানাইলেন।

শঙ্কর বলিল, আমিও একটা লেকচার দেব ভাবছি। লেকচার দিয়ে আপনাকে টাকাটা দেব।

শুনিয়া মিসেস সেন গম্ভীরমুখে লীলাময়ের দিকে চাহিলেন। লীলাময় অস্বস্তির সঙ্গে বলিলেন, কী বলবে না বলবে আগে থেকে ঠিক না করে এ রকম হঠাৎ লেকচার দেওয়া—

শঙ্কর শান্তভাবেই বলিল, পাগলামি করব না, ভয় নেই। যা বলা চলে তাই বলব, আপনাদের লেকচারের দাম কমবে না। ও সব ছেলেমানুষি আমার কেটে গেছে।

লীলাময় তবু বিপন্নভাবে বলিলেন, কালকের মিটিংটা থাক না ? এর পরের মিটিংটাতে তোমায় যদি বলতে না দিই, তা হলে কী বলছি। সেই ভালো হবে কেমন ? আগে থেকে খবরের কাগজে তোমার নাম বার করে দেব, যা বলবে পরদিন কাগজে সভার রিপোর্টে তারও খানিকটা—

শঙ্কর বলিল, কেবল কথায় কি চিরকাল চিঁড়ে ভেজে লীলাময়বাবু ! দিন না, এখুনি ফোন করে দিন না কাগজের আপিসে, আমার নামটা আপনাদের নামের সঙ্গে বক্তার লিস্টে ছাপিয়ে দিতে। পরশু যদি মিটিংয়ের রিপোর্টে আমার নামটাও যায়, আর কিছু টাকা না হয় বেশিই দেব।

মিসেস সেন আর লীলাময়ের চোখে চোখে কথা হইয়া গেল। মিসেস সেন শঙ্করের বাহুমূল ধরিয়া আদরের আর আবদারের সুরে বলিলেন, কেন এ রকম করছ শঙ্কর ? কালকের মিটিংটা থাক না ? এমন কত মিটিং হবে। আমি নিজে—

কিন্তু শঙ্কর একটু পাথর বনিয়া গিয়াছে, তাকে কোনো রকমেই দমানো গেল না। ব্যাপারটা একটু গোলমেলে। কেবল খবরের কাগজের আপিসে ফোন করলেই চলে না, দলের আরও যাঁরা আছেন, তাঁদের সঙ্গেও একটু কথাবার্তা হওয়া দরকার—কাল যদি তাঁহারা দলের বাহিরের এক ছোকরাকে বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া ছেলেখেলা করিতে দিতে আপত্তি করেন, যদি লীলাময়ের উপর সকলে চটিয়া যান ?

চিন্তিত মুখে লীলাময় বলিলেন, বড়ো হাঙ্গামায় ফেললে। অনেকগুলো ফোন করতে হবে। এখানে তো মাগনা ফোন নেই।

শঙ্কর মৃদু হাসিয়া বলিল, চলুন না ফোন করবেন, ফোনের পয়সা আমি দেব।

মিসেস সেনও মৃদু হাসিয়া বলিলেন, আর আজকের ফুর্তির পয়সা ?

শঙ্কর বলিল, তাও দেব।

পাকিয়া যেন একেবারে ঝানু হইয়া গিয়াছে শঙ্কর। নাম করার, বড়ো হওয়ার, প্রসিদ্ধিলাভের সমস্ত কলাকৌশল যেন তার নখদর্পণে। সে জানে, আরও অনেক কিছুই লীলাময়, মিসেস সেন আর তার সাঙ্গোপাঙ্গের পাবলিক লাইফের পিছনে আছে—আরও কদর্য, আরও কুৎসিত, আরও জটিল।

কিন্তু এ কথাও সে জানে যে, যতটুকু জ্ঞান সে অর্জন করিতে পারিয়াছে, সেটুকু ঠিকমতো প্রয়োগ করিতে পারিলে, ক্রমে ক্রমে আরও যত কিছু জানিবার আছে, সবই সে জানিতে পারিবে এবং জানিতে পারিয়া প্রয়োগ করিতে পারিবে নিজের প্রগতির উদ্দেশ্য।

প্রগতি ? ভাবপ্রবণ মন শঙ্করের, মিসেস সেনের ঈষৎ বিস্মিত দুষ্টামিভরা চাহনি ও হাসি সাঙ্গোপাঙ্গেব বীভৎস রসিকতা এবং অতৃপ্ত ক্ষুধিত অন্তরকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য তিলে তিলে আত্মহত্যা—সব একটা বিপরীত ভাব জাগাইয়া তোলে শঙ্করের মনে—গায়ের জোরে যে মনের ক্রিয়াকে এখানে সে ঘটাইয়া চলিয়াছে, অতিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিক্রিয়াও মন জুড়িয়া দাপাদাপি করিতেছে। এই কি প্রগতি ? একদিন না হয় সে নিজেকে করিয়া তুলিবে খ্যাতনামা, লোকে না হয় কয়েক মিনিট মনে রাখিবার জন্য সাগ্রহে তার কথা শুনিবে, কিন্তু কী হইবে সেই সাফল্যে ? দামি পোশাক গায়ে দিবার জন্য সর্বাগ্রে কুৎসিত ব্যাধিই যদি তাকে সঞ্চয় করিতে হয়, কী করিবে সে দামি পোশাক দিয়া ?

গভীর রাত্রে গভীর বেদনায় শঙ্করের ঘুম আসে না। এখন শুধু প্রতিক্রিয়া চলিতেছে কি না, বিষাদটা তাই বড়ো কটু। জীবনের রাজপথ খুঁজিয়া না পাইয়াও গলিঘুঁজি দিয়াই তো এতকাল সে খুশি মনে আগাইয়া আসিয়াছে, আজ শ্যাওলা-পিছিল নর্দমা দিয়া হাঁটিবার শখ মিটাইতে গিয়া একটি মাত্র আছাড় খাইয়াই যেন সর্বাঙ্গে টনটনে বেদনা ধরিয়া গেল।

শঙ্করের মা তরঙ্গের ব্যাপারটা লইয়া খেপিয়া যাইবার উপক্রম করিয়া দিলেন। একেই একটু স্নায়বিক বিকারগ্রস্ত মানুষ, সর্বদা অস্বাভাবিকতার মধ্যে আত্মপ্রকাশেব ইচ্ছাটা চাপিয়া চলিতে চলিতেই তাহার প্রাণান্ত হয়, তার উপর এত বড়ো একটা সুযোগ পাওয়া গিয়াছে। বিনা অসুখে কয়েক দিনের মধ্যে তিনি শীর্ণ হইয়া গেলেন, তারপর হঠাৎ আরম্ভ করিয়া দিলেন—রাগারাগি, চেঁচামেচি, গালাগালি আর মাথা কপাল কোটা। এটা শঙ্করের মার পক্ষে অভিনব। ভীরু, ভোঁতা, জীবনীশক্তির অভাবগ্রস্তা অকালবৃদ্ধা মানুষ তিনি, তাঁর পক্ষে এ রকম প্রচণ্ড উগ্রতা বেমানান এবং ভীতিকর।

ডাক্তার ওষুধ দিলেন। কিন্তু ওষুধে কী হইবে ? ওষুধের নেশায় শঙ্করের মা কেবল মড়ার মতো বিছানায় শুইয়া রাত্রিটা কাটাইয়া দিতে লাগিলেন। ওষুধটা অবশ্য ঘুমের, শঙ্করের মার মড়ার মতো পড়িয়া থাকাটাও অবশ্য সকলে ঘুম বলিয়া ধরিয়া লইলেন, কিন্তু প্রকৃতি দেবী যার নিদ্রা কাড়িয়া লইয়াছেন, কার ক্ষমতা আছে তাকে প্রকৃত নিদ্রা দান করিবে ?

ডাক্তার বলিলেন, চেঞ্জে পাঠাতে পারলে মন্দ হত না। এ সব রোগীর পক্ষে শহরের গোলমাল বড়ো খারাপ—বেশ একটু শান্ত নির্জন অ্যাটমসফিয়ারে—

চেঞ্জের ব্যবস্থা হইল। নামকরা একটা স্বাস্থ্যকর স্থানে—যেখানে এত লোক এত রকমের ব্যারাম লইয়া চেঞ্জে যায় যে, স্থানটি হইয়া থাকে রোগের আড়ত আর রুগ্‌ণ নরনারীর ভিড়ে শহরের মতোই জনপূর্ণ।

শঙ্করের মা বলিলেন, আমি দেশে যাব। দেশের জন্য আমার মন কেমন করছে।

বলিয়া বীরেশ্বরের পা ধরিয়া হাউহাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

বীরেশ্বর বলিলেন, কেঁদো না মা, কেঁদো না, দেশে যাবার জন্য কাঁদবার কী হয়েছে ? কালকেই আমরা দেশে বওনা হব।

ডাক্তার এ প্রস্তাবে সায় দিলেন। বীরেশ্বর নিজে, শঙ্করের মা, সীতা আর শঙ্করকে সঙ্গে করিয়া গেলেন দেশে।

দিন তিনেকের জন্য শঙ্কর অসুস্থা জননীর সঙ্গে দেশে গেল। একটা সভায় তার বক্তৃতা দিবার কথা ছিল, কিন্তু আর কী করা যায়, মার জন্য এটুকু ত্যাগ স্বীকার না করিলে চলে না।

ছেলেকে ছাড়িয়া দেশে যাইতে শঙ্করের মা কিছুতেই রাজি হইলেন না, কাঁদিয়া দেওযালে মাথা ঠুকিয়া ভয়ানক ব্যাপার আরম্ভ করিয়া দিলেন।

এবং ছেলের সঙ্গে দেশে যাওয়া মাত্র হইয়া গেলেন জড় পদার্থের মতো শান্ত ও নির্জীব। দেশের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে অনেককাল আগে একবার যে সলজ্জ নম্রতার সঙ্গে অনেক দিন বাস করিয়াছিলেন, এতকাল পরে আবার সেই বাড়িতে সেই আত্মীয়স্বজনের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া প্রথম বধূজীবনের সরমস্নিগ্ধ নম্রতাই যেন নির্জীবতায় রূপান্তরিত হইয়া তাঁহার মধ্যে ফিরিয়া আসিল।

দেশ দেখিয়া শঙ্কর কিন্তু পাইল আঘাত।

গ্রাম শঙ্কর দেখিয়াছে। ছেলেবেলায় এই গ্রামেও কয়েকবার সে আসিয়াছিল, ঝাপসা মনেও যেন আছে। তা ছাড়া, শহরতলির গ্রামে কতবার সে বেড়াইতে গিয়াছে, ট্রেনে কোথাও যাওয়ার সময় দুদিকে কত অফুরন্ত গ্রাম তার নজরে পড়িয়াছে, গ্রাম সম্বন্ধে কত বই সে পড়িয়াছে !

এ কী গ্রাম ? পথ-ঘাট বাড়ি-ঘর বন-জঙ্গল ডোবা-পুকুর এ সব কিছুই মনেব মধ্যে গ্রামের যে ছবিটি আছে তার সঙ্গে মেলে না, এখানকার মানুষগুলি তার মনের মধ্যে গ্রামের যে মানুষগুলি বাস করে তাদের স্বজাতি নয়, গ্রাম্য জীবনের যে রোমান্টিক কল্পনা মনের মধ্যে এতকাল সযত্নে পোষণ করিয়াছে, এই গ্রামে গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে তার পার্থক্য যেন কবিতার বই আর খবরের কাগজের।

বরং শহরের সঙ্গে এক বিষয়ে এ গ্রামের মিল আছে। এখানেও মানুষ তরঙ্গের মতো আত্মহত্যা করে।

তরঙ্গের বয়সি একটি বউ, তবে তরঙ্গেব মতো রূপসিও নয়, স্বাস্থ্যবতীও নয়। বাড়ির সম্মুখে জঙ্গল, বাড়ির পিছনে গ্রামের অধিকাংশ মানুষের মতোই রুগ্ণ ধানের খেতে স্বাস্থ্যহীন ধানগাছ, ডাইনে আমবাগান, বাঁয়ে প্রতিবেশীর বাড়ির চার ভিটার চারখানা পড়োপড়ো ঘরের মধ্যে একখানা ঘর কবে পড়িয়া গিয়াছে আর তোলা হয় নাই। এই অপূর্ব প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর মধ্যে নিজেদের প্রকাণ্ড জীর্ণ গৃহের গোয়ালঘবটিতে বউটি তরঙ্গকে অনুকরণ করিয়াছে।

গোয়ালঘরে আজ যে অনেক কাল ধরিয়া গোরু বাস করে না, সেটা অনুমান করা শক্ত নয়। এ বাড়ির লোক দুধ খায় না। এমনকী, গোয়ালঘরের সম্মুখে বয়স্কা রমণীর কোলে পাঁচ-ছ মাসেব যে কাঠির মতো ক্ষীণ খোকাটি ক্ষীণস্বরে কাঁদিতেছে, সেও খায় না। কোথায় পাইবে ? গোযালঘরে দড়িতে তার যে কঙ্কালসার জননী ঝুলিতেছে, তার শুষ্ক, আলগা চামড়ার মতো স্তন দুটিতে দুধ থাকা সম্ভব নয়।

## সাত

গ্রামে আসিয়া শহরের আসল রূপটা এতদিন যেন শঙ্কবের চোখে ধরা পড়িল—শহব একটা বিবাট আশ্রম, তাপসদের আড্ডাখানা। ধ্বংসের তপস্যা করিতে মানুষ শহরে যায়, ছোটোবড়ো অপমৃত্যুর লোভে মানুষ শহরে বাস করিতে ভালোবাসে। জীবন বিস্বাদ হইলে মানুষের আসে বৈরাগ্য, জীবন বিষাক্ত হইলে মানুষের আসে শহুরে জীবনের লোভ।

শহরে যারা যাইতে পারে না, গ্রামে যাদের বঞ্চিত বন্দী জীবনযাপন করিতে হয়, নিজেদের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া তারা গ্রাম্য জীবনেও আনিবার চেষ্টা করে যতখানি পারে শহুরে ভাব। শহরবাসী সকলের মতো গ্রামবাসীরা সকলে জানিয়া শুনিয়া এটা করে না, মানুষের অত বিবেচনাশক্তি নাই, না শহুরে মানুষ, না গ্রামের। না জানিয়া বুঝিয়া মূর্খের মতো নিজেকে, নিজের ভবিষ্যৎ বংশধরকে

তিল তিল করিয়া বিনাশ করিয়া ভাবে জীবনযাপন করিতেছি—যথা নিয়মে, যুগধর্ম অনুসারে—সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক বিধানের জোড়াতালি দেওয়া ফাঁদে পড়িয়া থাকার প্রয়োজন মিটানোর গভীর নিরানন্দে।

গ্রামের মানুষ দেখিয়া, মাটি দেখিয়া, গাছপালা দেখিয়া, মাঠের ফসল দেখিয়া, গোরু-ছাগল, কুকুর-বিড়াল দেখিয়া, কেবল মানুষের জন্য শঙ্করের মনটা খারাপ হইয়া যায়, একটা অদ্ভুত যন্ত্রণাবোধেব সঙ্গে তার মনে হয়, বাঁচিবার জন্য মানুষ পৃথিবীতে আসিয়াছে, অথচ মানুষ যেন বাঁচিতে চায় না। শহর ও গ্রাম কোথাও মানুষের জীবনযুদ্ধের নিয়ম, সংকেত ও কৌশলগুলি জানিবার বা শিখিবার ইচ্ছা নাই, জীবনের আসল উদ্দেশ্যের কথা ভুলিযা গিয়া সকলে নেহাত অনিচ্ছার সঙ্গে একটা উদ্ভট খাপছাড়া অভিনয় করিয়া চলিয়াছে।

বাঁচিবার উপায় ও পথ থাকিতে তাহা গ্রহণ না করার আর কী মানে হয় ?

কী সে উপায় ও পথ ? সে নিজেও তো তার সন্ধান জানে না !

নিজের চিন্তার এইখানে যেন একটা ফাঁদ পাতা আছে—বড়ো কবির জীবনদেবতার মতো কৌশলী মন-ধরা জীবন-ব্যাধেব আশ্চর্য ফাঁদ ! নিজের মনটাকে শঙ্কর কত বড়ো মনে করে, কিন্তু চিন্তার এই ফাঁদে পড়িয়া মনটা তার কবিতে থাকে চড়ুই পাখির মতো কিচিরমিচির !

বীরেশ্বর গম্ভীর মুখে পরিহাসের সুরে ডাকেন, শঙ্কববাবু !

আজ্ঞে বলুন।

আজ্ঞে বলুন ! জীবনে তো তোমার মুখে কখনও বলুন শুনিনি দাদু।

শঙ্কর একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলে, গাঁয়ে এসে শিখেছি।

আর কী শিখেছিস গাঁযে এসে ?

শিখেছি যে বেঁচে থাকতে হলে আধপেটা খেতে হয়, ঝগড়া মারামারি করতে হয়, খাবার পয়সা দিয়ে বিলাসিতা নেশা আর পাপ করতে হয়--

বীরেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, থাম শালা, থাম। তাই তো বলি তোকে স্বদেশি রোগে ধরেছে ! তুই দেশের লোকের ভাবনা ভাবছিস ! আমি এদিকে ভাবছিলাম, যার জন্যে ভেবে ভেবে কাহিল হচ্ছিস, সে ছুঁড়িটা কে ! দেশসুদ্ধ লোকের জন্য দরদ দিয়ে তুই যে বুকটা ফাটিয়ে ফেলছিস, তা কি জানতাম। এই জন্য তুই লীলাময়ের সঙ্গে মেলামেশা আরম্ভ করেছিস।

দেশের কথা ভাবাটা অন্যায় নাকি ?

তোর পক্ষে অন্যায়।

কেন? দেশের কথা ভাববার অধিকার আমার নেই ?

বীরেশ্বর তৎক্ষণাৎ বলিলেন, না।

শঙ্কর তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিল, কেন ?

তোরা যত দেশের কথা ভাববি, তত দেশের সর্বনাশ হবে বলে, বিনা চিকিৎসায় যত রোগী মরে, হাতুড়ের চিকিৎসায় তাব চেয়ে ঢের বেশি মরে বলে। ভাবতে জানিস তুই, ভাবতে শিখেছিস ? মন তোর সুস্থ, স্বাভাবিক ? আজ পর্যন্ত এমন একটা কাজ তুই করেছিস, যাতে প্রমাণ হতে পারে, একটা দিনের জন্যও তোর পক্ষে অতি সাধারণ, কিন্তু খাঁটি মানুষের বাচ্ছা হয়ে থাকা সম্ভব ? কবিতা লিখতে চাস লেখ, প্রেম করতে চাস কর, বিদ্বান হতে চাস হ, দেশের জন্য কেঁদে কেঁদে আর খ্যাপার মতো আবোল-তাবোল কাজ করতে চাস কর—কিন্তু খবরদার দেশের কথা ভাবিস না। তোদের মন হল জল, দেশের ভাবনা হল তেল—তোদের মনে ও ভাবনা মিশ খাবে না। আজ হোক, কাল হোক তোরা চুলোয় যাবিই, দেশের ভাবনা যারা ভাবতে পারবে তারা একদিন উদয় হবেই, হয়তো দু-একজন এরই মধ্যেই হয়েছে—দেশের ভাবনাটা ভাববার বরাত তাদের হাতেই ছেড়ে দে। দেশের

গায়ে বিষফোড়ার মতো উঠছিস, স্বদেশিয়ানা মলম দিয়ে নিজেকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করিস না, দোহাই তোর, পেকে উঠে ফেটে যা, দেশেব একটু খারাপ পুঁজবক্ত বেরিয়ে যাক !

ধরিতে গেলে বীরেশ্বরের এটা বক্তৃতা বইকী। কথাগুলিতে জ্বালা আছে, উত্তেজনা আছে, তবু সুরটা যেন তামাশার, মুখখানা বীরেশ্বরের শান্ত অথচ গম্ভীর। জীবনে শঙ্কর তাঁকে কোনোদিন এ ভাবে এ ধরনের কথা বলিতে শোনে নাই। খানিকক্ষণ অভিভূতের মতো সে বীরেশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নিজেকে কেমন মনে হইতে লাগিল ছেলেমানুষ, অনভিজ্ঞ অপবিত্র।

আমি একা তো বিষফোঁড়া নই ?

বীরেশ্বর যেন সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, তা হলে আর দেশেব ভাবনা কী ছিল ভাই ? দুটো-একটা বিষফোঁড়ায় দেশের কী আসে যায় ?

শঙ্কর চুপচাপ খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলিল, বিষফোঁড়ার তো চিকিৎসা দরকার ? উচিত তো চিকিৎসা করা ?

ফোঁড়াটা যাতে শরীরে বসে যায়, সেই চিকিৎসা ? তার চেয়ে চিকিৎসা না হওয়াই ভালো। জানিস শঙ্কর, পাপীকে দিয়ে পুণ্য কাজ করাতে নেই—তাতে পাপটাও জমে থাকে, পুণ্য কাজটাও নষ্ট হয।

কিন্তু সবাই যদি পাপী হয়, আর পাপীকে যদি পাপ ছাড়া আর কিছু কবতে দেওযা না হয়, তা হলে তো মানুষের ভবিষ্যৎ অন্ধকার !

পাপীকে যদি পাপ ছাড়া আর কিছু করতে দেওয়া না হত, মানুষের ভবিষ্যতে তা হলে ডে-লাইট জ্বলে উঠত।—বীরেশ্বর হঠাৎ হাসিলেন, মৃদু ক্ষোভের হাসি। কথার মারপ্যাঁচের মজাটা তিনি জানেন, বাঁদরের মতো মানুষকে নাচানোব এমন কৌশল আর নাই, মানুষকে বাঁচানোর এমন উপায়ও আর নাই। কিন্তু কেবল কথার মারপ্যাঁচে নয়, জোর করিয়া কেহ কিছু বলিলেই এই তেজস্বী নাতিটি তাঁব বিচলিত হইয়া দ্বিধা সন্দেহে দোল খাইতে আরম্ভ কবে, এমনই সে মহাপুরুষ ! অথচ নিজের সম্বন্ধে কত বড়ো ধারণাই সে আত্মপ্রতারণাব রসে দিনেব পব দিন বাড়াইযা আসিয়াছে ! আমিত্ববোধের বন্যায় কোথায় যে ভাসিয়া গিয়াছে তার আমিত্ব !

দোতলার বাবান্দায় বসিয়া বীরেশ্বর শঙ্করের সঙ্গে কথা বলিতেছেন, নীচেব তলায যে ঘবে শঙ্কর জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, সেই ঘরের অঙ্গনে একটা খেঁকিকুকুর তাড়াতাড়ি কী যেন একটা অখাদ্য বস্তু গলাধঃকরণ করিতেছিল। কুকুরটার খাওয়া দেখিতে দেখিতে বীরেশ্বরের হাসির ক্ষোভটুকু মিলাইয়া গেল। শঙ্কর মুখ খুলিবার উপক্রম কবিতেছিল, তাহাকে সে সুযোগ না দিযা তিনি আবার বলিলেন, পাপের ক্ষয় হয় প্রায়শ্চিত্তে—পাপের প্রায়শ্চিত্ত কী জানিস শঙ্কর ? পাপ ! পাপ করার চেয়ে বড়ো শাস্তি পাপীর আর কিছু আছে ? এক যুগে হোক, একশো যুগে হোক, পাপ কবে করে পাপীর পাপ ক্ষয় হয়ে যায়। বিষফোঁড়া উঠে উঠে দেশের বিষও একদিন ক্ষয় হযে যায়।

শঙ্কর হঠাৎ হাসিয়া ফেলিল, আপনি মহাপাপী দাদু।

কীসে জানলি ?

দেশের কথা নিয়ে কবিত্ব আর তামাশা করছেন।

সীতা পিসিমাও বলেন, তুই যেন কী রকম হয়ে যাচ্ছিস শঙ্কর।

নিজের কথাটাই আরও স্পষ্ট করিবার জন্য আবার বলেন, মুখখানা কী রকম শুকনো দেখাচ্ছে তোর।

একটা ঢোঁক গিলিয়াই চোখ নামাইযা লজ্জার সঙ্গে বলেন, তোর সঙ্গে এ সব কথা বলা অবশ্য আমার উচিত নয়, তবু, না বলেই বা কী করি বল ? তরঙ্গের জন্য মন খাবাপ করিস না শঙ্কর। যে কীর্তি করেছিল মেয়েটা, ও যে গেছে ভালোই হয়েছে। আমি জানি, আমার কথা শোন, তরঙ্গের জন্য মন খারাপ করিস না।

শঙ্কর একটু কড়া সুরে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা মন খারাপ করব না। কিন্তু তরঙ্গ কী কীর্তি করেছিল শুনি ?

আমি তা বলতে পারব না বাপু।

সীতা পিসিমার ভারী একটা মজার খেলা জুটিয়াছে। নানা ছলে একে একে সকলকেই তিনি জানাইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, তরঙ্গের সম্বন্ধে তিনি একটা ভয়ংকর কথা জানেন, কিন্তু কথাটা যে কী, তা তিনি বলতে পারবেন না বাপু। তরঙ্গের কথা ভাবিয়া মনটা হয়তো সীতা পিসিমার সত্যই খারাপ হইয়া যায়, চোখে জলও দেখা যায় মাঝে মাঝে, কিন্তু কী করিবেন, এত বড়ো একটা নাটকীয় ব্যাপারকে ঠিকমতো কাজে লাগাইতে না পারিলেই বা তাঁর চলিবে কেন ? এ কী অভাবনীয় সৌভাগ্য তাঁর যে, তরঙ্গের একটা গভীর রহস্যময় গোপন কথা এ জগতে কেবল তিনিই জানেন, আর কেহ জানে না! ভাবিলেও সীতা পিসিমার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া ওঠে।

তরঙ্গকে কড়িকাঠে বাঁধা দড়িতে ঝুলিতে দেখিয়াও তাঁর সে রকম শিহরন জাগে নাই !

শঙ্করের সঙ্গেই নানা ছুতায় তরঙ্গের কথা আলোচনা করিবার জন্য সীতা পিসিমার বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। শঙ্করের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথাটাও যেন তাঁর স্মরণ থাকে না। মরে তরঙ্গ বেঁচেছে শঙ্কর। ছুঁড়ি যদি বেঁচে থাকত— এই ধরনের আলাপ আরম্ভ করিয়া শঙ্করের মুখে বেদনার ছায়াপাত হইতে দেখিলে সীতা পিসিমাব মন গভীব তৃপ্তিতে ভবিযা যায়। শঙ্করের জন্য অকস্মাৎ তাঁর হৃদয়ে মমতা করার এই উগ্র অনুভূতির স্বাদ তাঁকে পাইতে হয় বটে, কিন্তু কী করিবেন তিনি, জীবনের সাধারণ সহজ অনুভূতিতে সাধ যে তাঁর মেটে না, তৃপ্তি যে তিনি পান না।

শেষ পর্যন্ত সীতা পিসিমার হাত এড়াইবার জন্যই শঙ্কর পলাইয়া যায় কলিকাতায়।

একটা বড়ো সভায় শঙ্করের অবশ্য বক্তৃতা দিবার কথা ছিল, মাব জন্য একটা বক্তৃতার সুযোগ সে নষ্ট করিয়াছে, এবার যথাসময়ে কলিকাতায় সে চলিয়া আসিতই। কিন্তু বক্তৃতার কয়েকটা দিন দেরি ছিল। সীতা পিসিমা যেভাবে তাকে মমতা করিয়া আনন্দ সংগ্রহ্ করিতেছিলেন, গ্রামের বঞ্চিত নরনাবীকে তেমনিভাবে মমতা করিয়া সেও তেমন আনন্দই অনুভব কবিতেছিল। সীতা পিসিমা পিছনে না লাগিলে আরও কয়েকটা দিন গ্রামে সে থাকিত।

বক্তৃতা দিবার কায়দা সে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে, সুরে সুর মিলাইয়া উঁচু-নিচু গলায় সে চমৎকার বলিতে পারে। অনেক হাততালিও পায় ! কয়েকবারের অভিজ্ঞতা হইতে সে বুঝিতে পারিয়াছে যে, শ্রোতাদের বালক কল্পনা করিয়া ভয় আর লজ্জা ত্যাগ করিতে পারিলেই দেখা যায়, বলাটা অতি সহজ।

শঙ্কর চলিয়া যাওয়ার দুদিন পরেই হঠাৎ অনুপমের সঙ্গে সাধনা গ্রামে আসিয়া হাজির হইলেন। শঙ্করের মার মতো তাঁরও নাকি দেশে আসিবার জন্য মনটা কেমন করিতেছিল, সকলে দেশে আসিয়াছে শুনিয়া তাই দু-একটা দিনের জন্য বেড়াইতে আসিয়াছেন।

কিন্তু সাধনার ভাব দেখিয়া মনে হইল, দেশের জন্য তাঁর মন কেমন করে নাই, কয়েকদিন বীরেশ্বরের কাছে আসিয়া থাকিবার জন্যই মন কেমন করিয়াছিল। কলিকাতার বাড়িতে শ্বশুরের কাছে থাকিবার তাঁর উপায় নাই, স্বর্গীয় স্বামীর নিষেধটা স্পষ্টভাবে অবহেলা করিতে সাধনার তেজস্বিতা আর আত্মমর্যাদাজ্ঞানে বাধে। তবে দেশের কথা আলাদা। দেশের বাড়ির কথা স্বামী কিছু বলিয়া যান নাই, কিছুদিন আগে পুরানো কলহ-বিবাদের কথা ভুলিয়া নিজের বাড়িতে গিয়া থাকিবার জন্য বীরেশ্বরের নিমন্ত্রণটা রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিবার সঙ্গেও দেশের এই বাড়িতে আসার কোনো সামঞ্জস্য নাই।

অনুকে নিয়ে বড়ো ভাবনায় পড়েছি বাবা।

অনুপমকে দেখিলেই বোঝা যায়, তার জন্য ভাবনায় পড়া তার মার পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নয়।

বীরেশ্বর বলিলেন, আস্তে আস্তে হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে মা।

দিনরাত বসে বসে কী যেন ভাবে, আর নয়তো পথেঘাটে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। নাওয়া-খাওয়ার দিকে নজর নেই, রাতে ঘুমোয় কিনা সন্দেহ—কী রকম চেহারা হয়েছে দেখেছেন তো ?

বীরেশ্বর নীরবে সায় দিলেন !

চাপা আর্তনাদের সুরে সাধনা বলিলেন, পাগল-টাগল হয়ে যাবে না তো ?

পাগল বলেই তো এ রকম করছে।

সাধনার সবটুকু আত্মবিশ্বাস নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মানুষটা যেন একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছেন। সকাতর অনুনয়ের সুরে তিনি বলিতে লাগিলেন, আপনি কিছু করুন বাবা ওর জন্যে, আমি হার মেনেছি। আপনি ছাড়া কেউ ওকে সামলাতে পারবে না। এত অশান্তি আমার আর সহ্য হয় না বাবা, তরঙ্গের মতো আমিও শেষে গলায় দড়ি দিয়ে বসব।

অনুপম এই বাড়িতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, যে ঘরটিতে শঙ্কর জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, সেই ঘরেই। দোতলার এই বারান্দা হইতে অনেক দূর পর্যন্ত গ্রামেব কাঁচা ঘরবাড়ি দেখা যায়, মাঝে মাঝে দুটি-একটি ছোটোবড়ো দালান। ঘরবাড়িগুলিব অধিবাসীদের কারও মনে শান্তি আছে কিনা সন্দেহ, গ্রামের আবহাওয়াটি কিন্তু বড়োই শান্ত। শান্তিপূর্ণ শ্রীহীনতা চাবিদিকে এমনভাবে পরিব্যাপ্ত হইযা আছে যে অনভ্যস্তের রীতিমতো অস্বস্তি বোধ হয়। আজ আবার কোথা হইতে একটা পচা গন্ধ নাকে আসিয়া লাগিতেছিল—বায়ু আজ হঠাৎ দিক পরিবর্তন করিয়াছে। এতদিন বাতাস কেবল বদ্ধ ঘবেব ভ্যাপসা বাতাসেব মতো ছিল—এমন কটু পীড়াদায়ক গন্ধ বহিয়া আনে নাই।

বীরেশ্বর ম্লান মুখে বসিযা বসিয়া ভাবেন। অনুপমকে বুঝাইয়া শান্ত, সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ করিবার ক্ষমতা কী তাঁর আছে ? এ পাগলামি অনুপমেব কোনোদিন কমিবার নয়—কেবল এখন বাড়াবাড়ি দেখা দিযাছে, সেটুকু ধীবে ধীরে কমিয়া যাইবে, যদি আবার বাড়াবাড়ি করিবার নূতন কোনো কারণ না ঘটে। কী বলিবেন তিনি অনুপমকে ? নিজের জীবনের ইতিহাস বীরেশ্বরেব টুকবা টুকরা মনে পড়িতে থাকে—অন্যভাবে তিনিও জীবনে অনেক পাগলামি করিয়াছেন। অসাধাবণ অবস্থায় কখনও কখনও কোনো একটি বিশেষ বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হইয়া পাগলামি তাঁব এমনই বাড়াবাড়িতেও পরিণত হইয়াছে অনেকবার—অন্য সময় নানাভাবে নানা উপলক্ষে নানা বিষয়ে কমবেশি প্রকাশ পাইযাছে। তবে রামলাল, শ্যামলাল, সীতা, শঙ্কর, অনুপম এদের মতো এতখানি বিভ্রান্ত ও বিধ্বস্ত তিনি ছিলেন না। তাঁর সময়ে পারিপার্শ্বিকতার জাঁতায় এমন ভীষণভাবে মানুষ নিষ্পেষিত হইত না, মানুষের জীবন এমনভাবে গুঁড়া হইয়া যাইত না।

শঙ্কর ও অনুপমেব ছেলেমেয়েরা না জানি কী রকম হইবে ?

অনুপমের সঙ্গে কথা বলিয়া বীবেশ্বর দেখিলেন, তাকে কিছু বোঝানো অসম্ভব। সে এমন ধীব, স্থির ও অন্যমনস্ক যে, কোনো কথাই এক রকম তার কানে যায় না।

তা ছাড়া সে ভয়ংকর নির্লজ্জও হইয়া পড়িয়াছে।

তরঙ্গ আমার সব দিক দিয়ে সর্বনাশ করে গেছে দাদামশায়।

কথা বলিবার সময় লজ্জায় অনুপম মাথা তুলিতে পারে না, কিন্তু বীরেশ্বরের মনে হয এমন নির্লজ্জ মানুষ জীবনে তিনি আর দেখেন নাই।

তা হোক, ছেলে অনুপম ভালো—পড়াশোনায়। সাধনা যেমন মনে করিয়াছিলেন, আর অনুপম যেমন কল্পনা করিয়াছিল, সে রকম না হইলেও পরীক্ষার ফলটা তাহার ভালোই হইয়াছে দেখা গেল। তরঙ্গের জন্য কিছুদিন সে যে রকম হইয়া গিয়াছিল, সে হিসাব ধরিলে এ একটা রীতিমতো বাহাদুরি বলিতে হইবে বইকী।

শঙ্করের মার গাঁয়ে থাকার শখ মিটিয়া যাওয়ার পর সকলে আবার শহরে ফিরিয়া আসিলে, ছেলের পরীক্ষার ভালো ফল হওয়া উপলক্ষে সাধনা একদিন সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। বীরেশ্বরকে এক ফাঁকে বলিলেন, আপনার কথাই ঠিক হল বাবা, নিজে নিজেই আস্তে আস্তে বেশ সামলে উঠেছে।

অনুপম সাধনার বিশেষ অনুরোধে বীরেশ্বরকে একটু ঘটা করিয়াই প্রণাম করিল। বীরেশ্বর মনে মনে কোনো আশীর্বাদ করিলেন কিনা বোঝা গেল না, মুখে শুধু বলিলেন, ঠিকমতো প্রণাম করতে কোথায় শিখলি রে শালা ?

সীতা পিসিমা কিন্তু অনুপমের শরীর ভালো হইয়াছে আর পাগলামি কমিয়াছে দেখিয়া যেন বড়োই ক্ষুণ্ণ হইয়া গেলেন।

তাঁর কেবলই মনে হইতে লাগিল, অনুপম যেন ফাঁকি দিয়াছে, তাঁকে ঠকাইয়াছে। ভারী একটা অন্যায় কাজ করিয়াছে অনুপম। একেবারে অমার্জনীয় অপরাধ। তরঙ্গ না অনুপমকে অত বড়ো একটা চিঠি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিল ? কয়েক মাসের মধ্যে এভাবে তরঙ্গকে অনুপম ভুলিয়া যায় কোন সাহসে ? সংসারে কি ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত বলিয়া কিছু নাই ? সীতা পিসিমার বিশেষ কষ্ট হয় এই জন্য যে, তিনি যে রকম কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলেন, সে রকম কিছুই ঘটিল না। অনুপম গোপনে ক্রমাগত অশ্রুপাত করিবে, সকালে দেখা যাইবে বালিশটা তার ভিজিয়া চপচপ করিতেছে, প্রকাশ্যে থাকিয়া থাকিয়া অনুপমের চোখ ছলছল করিবে, দিনদিন শুকাইতে শুকাইতে সে হইয়া যাইবে কাঠ, চালচলন ভাবভঙ্গি দেখিয়া প্রতিনিয়ত মনে হইতে থাকিবে, আর সহ্য করিতে না পারিয়া এই বুঝি সে গেরুয়া পরিয়া হইয়া গেল সন্ন্যাসী ! তার বদলে এ কী খাপছাড়া কাণ্ডকারখানা অনুপমের ! কিছুদিন জ্বরে ভুগিয়া মানুষ যেমন ভালো হইয়া ওঠে, সে যেন তেমনইভাবে ধীরে ধীরে গা ঝাড়া দিয়া উঠিতেছে !

বাড়িতে লোকজন আসায় অনুপমের সত্যই বেশ ভালো লাগিতেছিল। সকলের সঙ্গে সস্মিতমুখে সে কথাবার্তা বলে, পাড়ায় কয়েকটি বন্ধুশ্রেণির ছেলের সঙ্গে হাসিতামাশা করে, তাদের সঙ্গে খাইতে বসিয়া একপেট খায়, বিকেলের দিকে কারও অনুরোধের অপেক্ষা না রাখিয়া নিজেই বাড়িতে ছোটোখাটো একটি গানের আসর বসায়। মনে হয় বাড়িতে যেন উৎসবের আমেজ লাগিয়াছে।

সাধনার মুখে হাসি ফুটে। সীতা পিসিমার বুক ফাটিয়া যাইতে থাকে।

কেন এমন হইল ? কেন অনুপম তাঁকে পাশে বসিয়া গায়ে মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে ধরা গলায় বলিবার সুযোগ দিল না যে, তরঙ্গ অনেক করিয়া তাঁকেই দেখিতে বলিয়া গিয়াছে, অনুপম যেন ভয়ানক মুষড়াইয়া না যায়, খাপছাড়া কিছু না করে ? হায়, তরঙ্গ যে নাটকীয় কাজের ভার তাঁকে দিয়া গিয়াছে, সেটা করিবার সুযোগ বুঝি অনুপম আর তাঁকে দিল না।

সন্ধ্যার সময় সীতা পিসিমার আর সহ্য হয় না ! মানুষের পক্ষে প্রায় অব্যবহার্য অস্বাস্থ্যকর যে ঘুপচির মতো ঘরটির মধ্যে তরঙ্গ শখ করিয়া বাস করিত, অনুপমকে সেইখানে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলেন, আর তো তোমায় না বলে থাকতে পারছি না অনু।

কী পিসিমা ?

পাড়ায় কোথায় শাঁখ বাজে, পরপর তিনবার।

তরঙ্গ যা লিখে রেখে গিয়েছিল—চিঠির যেটুকু আমি পুড়িয়ে ফেলেছিলাম, তাতে। তুই কতবার জানতে চেয়েছিলি, বলিনি—বলতে পারিনি। আজ তোর মুখ দেখে আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে অনু।

অনুপম বিবর্ণ হইয়া যায়। আবছা অন্ধকারে তার মুখের ভাব পরিবর্তন যতটুকু চোখে পড়ে, তাতেই সীতা পিসিমার বুক দুরদুর করে।

অনুপম প্রশ্ন করিবে, এই প্রতীক্ষায় তিনি দাঁড়াইয়া থাকেন। অনুপম কিন্তু চুপ করিয়া থাকে, তরঙ্গের চিঠির গোপন রহস্য জানিবার জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করে না।

অগত্যা সীতা পিসিমা নিজেই বলেন, তরঙ্গ শঙ্করকে ভালোবাসত।

অনুপম তবু চুপ করিয়া থাকে।

শঙ্করের জন্যই তো তোদের বাড়ি ছেড়ে হঠাৎ ও বাড়িতে চলে গেল।

তরঙ্গের হৃদয়ের গোপন রহস্য ব্যক্ত করিলেন, কথাটা যে সত্য তার প্রমাণও দিলেন, তবু অনুপম একটা অস্ফুট আর্তনাদ পর্যন্ত করিয়া উঠিল না দেখিয়া সীতা পিসিমার চোখে জল আসিয়া পড়িল। হঠাৎ অনুপমকে ঠেলিয়া দিয়া তরঙ্গের সেই চোরাকুঠি হইতে নামিয়া আসিতে গিয়া পায়ে পা জড়াইয়া তিনি গেলেন পড়িয়া। গড়াইতে গড়াইতে অর্ধেকটা সিঁড়ির বাঁকের মুখে রেলিংয়ে তিনি আটকাইয়া থাকিলেন।

সীতা পিসিমা আর্তনাদ করিতে লাগিলেন এবং প্রতিবেশী আর একটা বাড়িতে শাঁখ বাজিল। পাড়ায় তিন-চারটি বাড়িতে আজও শাঁখ বাজাইয়া সন্ধ্যার বন্দনা হয়।

## আট

...যে চণ্ডীপাঠ করতে পাবে সেও সাধারণ লোক, যে জুতা সেলাই করতে পাবে সেও সাধারণ লোক, কিন্তু যে চণ্ডীপাঠও করতে পারে, জুতা সেলাইও করতে পারে, তার অসাধারণ প্রতিভায় মানুষ মুগ্ধ হয়ে যায়। মোহ মানুষকে এইভাবে আক্রমণ করে। মানুষের মনে থাকে বিকার এবং চিরন্তন বা সাময়িক বীতিতে পরিচালিত জগতে আপাত-বিপরীতের সমন্বয় মানুষকে সহজে কাবু করে ফেলে। চণ্ডীপাঠ করতে জানে বলে কাবও জুতা সেলাই করতে না জানার কোনো কারণ নেই, তবু চণ্ডীপাঠ থেকে জুতা সেলাই পর্যন্ত যে জানে, আমাদের কাছে সে মহাপুবুষ : মানুষকে দেবতা বলে পূজা কবাটা আমাদের কাছে কঠিন নয়, মানুষকে পশু বলে ঘৃণা করাটা আরও সহজ, কিন্তু মানুষকে মুখে চণ্ডীপাঠ করে হাতে জুতা সেলাই কবতে দেওয়া আমাদের কাছে সৃষ্টিছাড়া খাপছাড়া ব্যাপার।

এমন সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার যে, এ বিষয়ে আমরা একটা চলতি ব্যঙ্গ সৃষ্টি করে ভাষার ব্যবহার করি। আমরা ব্যঙ্গপ্রিয় জাতি। আপনারা জানেন, সেই ব্যঙ্গই সবচেয়ে জোরালো হয়, যে ব্যঙ্গে আপাত-বিপরীতের সমন্বয়টা খুব স্পষ্ট—আকাশ বললে যখন পাতাল বোঝায়, তখন ব্যঙ্গটা ক্ষীরেব মতো জমাট বাঁধে। ভিখারিকে বাজা বলার চেয়ে বড়ো ব্যঙ্গ আর কী আছে ? একজন চণ্ডীপাঠ থেকে জুতা সেলাই পর্যন্ত জানে বললে সোজাসুজি অর্থটা দাঁড়ায় এই যে, লোকটা জানে না এমন কাজ নেই, কিন্তু আমরা কী তাই বোঝাতে চাই ? আমরা বোঝাতে চাই যে, লোকটা কিস্সু জানে না ! এখন স্কুলে-কলেজে আমরা যে শিক্ষা পাই, তাও অনেকটা চণ্ডীপাঠ থেকে জুতা সেলাই কবতে শেখার মতো, অথচ আশ্চর্য এই—

শ্রোতারা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে না, প্রাণপণে হাততালি দেয় ! কলেজের প্রকাণ্ড হলটা হাততালির আওয়াজে গমগম করিতে থাকে। ছেলেদের মধ্যে যাদের স্নায়ু একটু বেশি দুর্বল, তারা রোমাঞ্চও অনুভব করে। তাদের কলেজের একজন একস্‌স্টুডেন্ট এমন সুন্দর ভাবিতে পারে ভাবিয়া কতকগুলি তরুণ বক্ষই যে ব্যথিত গৌরবে ভরিয়া যায় !

কিন্তু হাততালিতে অনুপমের যেন চমক ভাঙে। কলেজে পুরাতন ছাত্রদের বাৎসরিক মিলনোৎসবে যোগ দিবার কোনো ইচ্ছা তাহার ছিল না, দুটি উৎসাহী ছেলের টানাটানিতে আসিয়াছে। কলেজের ছেলেদেরই কবিতাপাঠ, ক্যারিকেচার, মাসল কন্ট্রোল ইত্যাদি দিয়া যে মিলন-সভায় নিমন্ত্রিতদের এন্টারটেন করা হইয়াছে, সেই সভায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিবারও কোনো ইচ্ছা তাহার

ছিল না, সেই উৎসাহী ছেলে দুটির ঠেলাঠেলিতেই কিছু বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু চণ্ডীপাঠ আর জুতা সেলাই করা সম্বন্ধে কিছু বলিবার ইচ্ছা তার ছিল না, স্কুলকলেজের শিক্ষার সমালোচনা করার কথাও সে ভাবে নাই। ও সব বলাও রীতি নয়—কলেজ জীবনের স্মৃতি সে জীবনে কখনও ভুলিতে পারিবে না, আজ এই মিলনোৎসবে যোগ দিতে পারিয়া গভীর আনন্দে মুখে তার ভালো করিয়া কথা সরিতেছে না—জড়াইয়া জড়াইয়া এই ধরনের কিছু বলিলে শোনাইতও ভালো, নিয়ম রক্ষাও হইত।

তার বদলে এ সব সে কী বলিতে আরম্ভ করিয়াছে ? আবোল-তাবোল কথাগুলি শুনিয়া ছেলেরাই বা এত খুশি হইল কেন ? অভিযোগের ভঙ্গিতে ব্যঙ্গ করিয়া কিছু বলিলেই বোধ হয় ছেলেদের ভালো লাগে—খেইহারা রসাল নিন্দা আর সমালোচনা !

কথাটা অনুপমের অসম্ভব মনে হয় না। যে ধরনেব গান, কবিতাপাঠ, ক্যারিকেচার আর মাসল কন্ট্রোল সকলের হাততালি আদায় করিয়াছে !

কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, প্রফেসর ও নিমন্ত্রিত বয়স্ক ভদ্রলোকেরা বিশেষ অস্বস্তি বোধ করিতেছেন বুঝিতে পারিয়াও অনুপম কিন্তু থামে না, বেশ করিয়া কলেজের শিক্ষা আর কলেজে শিক্ষিত ছেলেদের একচোট গালাগালি দেয়। শুনিয়া ছেলেদের সে কী উল্লাস ! একপাশে জন ত্রিশেক মেয়ে বসিয়াছিল, তাদের মধ্যেও অনেকের চোখদুটি উত্তেজনায় ছলছল করিতে থাকে, আনন্দের আতিশয্যে ঠোঁট চাপিয়া হাসিতে ভুলিয়া যাওয়ায় কারও কারও অসমান নোংরা দাঁতগুলিও আত্মপ্রকাশ করিয়া বসে।

সেই হইল সূত্রপাত। পরদিন দুটি সমিতি অনুপমকে সদস্য করিয়া লইল। একটি সমিতির নাম 'দি স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন ফর দি প্রোটেকশন অব এভরিবডিজ রাইট্স ইনক্লুডিং স্টুডেন্টস' অপরটির নাম 'শিক্ষা সমাজ ও সাহিত্য সংস্কার সমিতি'। প্রথমটির প্রেসিডেন্ট একজন অল্পবয়সি অধ্যাপক, অন্তত চেহারা দেখিলে মনে হয়, বয়স ভদ্রলোকেব বেশি নয়। একটা বিলাতি উপাধি আছে, কিন্তু সবজান্তার নিবিড় বিনয়ে সর্বদা টইটম্বুর হইয়া থাকেন। ছাত্র এবং ছাত্রীদের বড়ো ভালোবাসেন, তাদের সমস্ত সভাসমিতি উৎসব অনুষ্ঠানে হাজিরও থাকেন। প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ সভাসমিতি উৎসব-অনুষ্ঠানের গোড়াপত্তনের সময় ছাত্রছাত্রীরা তাঁর কাছে পবামর্শের জন্য ছুটিয়া আসে।

জন দুই ভক্ত ও সমিতির সদস্য এবং ছাপানো প্যাম্ফলেট, কার্ড ইত্যাদি অস্ত্র লইয়া নিজেই তিনি অনুপমকে আক্রমণ করিতে তাঁর বাড়িতে আসিয়া হাজির হন। অমায়িক হাসি হাসিয়া বলেন, আমি দি স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন ফর দি প্রোটেকশন অব এভরিবডিজ রাইটস ইনক্লুডিং স্টুডেন্টস-র প্রেসিডেন্ট সরসীলাল ভাদুড়ী।

শুনিলে মনে হয় তাঁর জগদ্‌বিখ্যাত নামটি যদি এ পর্যন্ত অনুপমের কানে না পৌঁছিয়া থাকে, অনুপম যে জগতে সবচেয়ে অপদার্থ লোক, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইতে পারিবেন।

বসিতে বলিয়া ভদ্রতা করার উপায় ছিল না, কারণ ভদ্রলোক আগেই বসিয়াছিলেন। অনুপম তাই বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

তোমাকে আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার হতে হবে !

বেশ।

দ্বিতীয় সমিতিটির সম্পাদক একটি ছাত্র। নাম ব্রহ্মানন্দ চক্রবর্তী, বয়স বছর চব্বিশ, চেহারা আশ্চর্য রকমের সুন্দর। সর্বদা ক্রুদ্ধ হইয়া আছে, কিন্তু ক্রোধটা যে কাহার বা কীসের উপর নিজেও ভালো বোঝে না, অপরকেও বুঝাইতে পারে না। বুঝাইবার চেষ্টা আরম্ভ করিলেই ক্রুদ্ধ মুখখানি তাহার ক্রোধে একেবারে টকটকে লাল হইয়া যায়।

আপনারাও যদি আমাদের সমিতিতে যোগ না দেন, যদি দশজনের মতো কেবল নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করাটাই জীবনে একমাত্র কর্তব্য বলে মনে করেন—

অনুপম বলে, আমি কি বলেছি যোগ দেব না ?

কিন্তু এত সহজে ব্রহ্মানন্দের ক্রোধের উপশম হয় না। সহজে কেন, কিছুতেই হয় না।

আপনি না বলতে পারেন, আপনার মতো অনেকেই বলে। লেখাপড়া শিখে কোনো রকমে একটা চাকরি বাগিয়ে বিয়েটিয়ে করে ঘরসংসার কবাটাই যেন মানুষের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য !

আপনি বিয়ে করেছেন ?

আমি ? আমি বিয়ে করব !

ব্রহ্মানন্দের মুখ দিয়ে কথা সবে না।

এইভাবে অনুপমের জীবনের গতিও শঙ্করের জীবনের গতির সঙ্গে একাভিমুখী হইয়া গেল। শঙ্কর যাত্রা আবম্ভ করিল একেবারে প্রকাশ্য রাজপথে—স্বেচ্ছায়। অনুপম যাত্রা আরম্ভ করিল সরু গলিতে—পরের ইচ্ছায়। শঙ্করকে ভিড়ের মধ্যে নিজের পথ করিয়া লইতে হইল ধাপ্পাবাজিব জোরে—অনুপমকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল একদল ছেলেমানুষের নির্বোধ উচ্ছ্বাস।

কিন্তু দেখা গেল, অনুপমের পসার জমিতেছে তাড়াতাড়ি, শঙ্কর যেখানে আর দশজন মহাপুরুষের সঙ্গে বিচরণ করিবার অধিকার লাভের জন্য প্রাণপাত করিতেছে, বিনা চেষ্টায় অনুপমও আগাইয়া চলিয়াছে সেইখানেই। ছেলেবা অনুপমকে পছন্দ করে, ছাত্রছাত্রীমহলে তাব নাম ছড়াইয়া পড়িতেছে। যে কোনো অনুষ্ঠানই হোক, ছেলেরা তাহাকে টানিয়া লইয়া যায়। কিছু বলিতে হয় অনুপমকে। কী যে সে বলে ভালো বোঝা যায় না, কারণ, মনে যা আসে তাই সে বলিয়া যায়। কিন্তু স্কুলে মাস্টার আর কলেজে প্রফেসরদের ব্যাখ্যামূলক লেকচার শুনিতে অভ্যস্ত ছেলেদের কাছে তার ঈষৎ ভয়ে ভয়ে আবোল-তাবোল কথা বলাটাই মনোহর লাগে। অনুপমের দাঁড়ানোর ভঙ্গি, কথা বলার সময় মুখ ছাড়া হাত প্রভৃতি শরীরেব বাড়তি অঙ্গগুলি লইয়া অস্বস্তি বোধ করিবার ভঙ্গি, মাঝে মাঝে নাকের ডগা চুলকানো, এ সব দেখিয়া ছেলেদেব একটা গভীর মমত্ববোধ জাগে। অনুপমকে মনে হয় ঘরের লোক। ছাত্রীরা সাধারণত মুচকি মুচকি হাসে, তবে কারও কারও মধ্যে বাৎসল্যের সঞ্চারও হয়।

অন্তত আশালতার যে হয় তাতে সন্দেহ নাই।

পছন্দসই ছেলে দেখিলে একদিন, খুব বেশি দিন আগের কথা নয়, তার শুধু প্রেমেরই সঞ্চার হইত। কিন্তু একবার শুধু একটু অসাবধানতার জন্য, তাও বড়ো বেশি দিনের কথা নয়, মাতৃত্বের পথে মাস তিনেক আগাইবার সুযোগ পাওয়ার পর, বাৎসল্য ভিন্ন আর কিছুই সে অনুভব করিতে পারে না।

নিজে যাচিয়া সে অনুপমের সঙ্গে পরিচয় করিল।

আপনাকে দেখলেই বোঝা যায় আপনার মধ্যে এমন কিছু আছে, আজকাল মানুষের মধ্যে যা খুঁজেই পাওয়া যায় না। সরলতা, তেজ, আদর্শ, অনুরাগ, ন্যাচুরেল পোইজ—

মনে হয়, যেন অনুপমের পিঠ চাপড়াইয়া দিবে !

একদিন আসবেন আমাদের বাড়ি ? আপনার সঙ্গে ভালো করে আলাপ করতাম।

নিশ্চয় যাব।

আজকেই চলুন না ? এখনও আটটা বাজেনি।

অনুপম মুখে বিষাদের ভাব ফুটাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, আজ ? আজ আমায় মাপ করতে হবে। বাড়িতে মার শরীর ভালো নয়—

আশালতা দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া বলিল, মার শরীর খারাপ ? যান যান শিগগির বাড়ি যান। আমিও রইলাম, আপনিও রইলেন, একদিন গেলেই হবেখন আমাদের বাড়ি। মাকে ফেলে কী করে যে এলেন।

সাধারণ জ্বর হইয়াছিল। সামান্য জ্বর। দুপুরে একবার শয্যাগ্রহণ করিয়াছিলেন, বিকালে আবার উঠিয়াছেন। অন্যদিন অনুপম কিছুই বলিত না, আজ সদ্য সদ্য আশালতার ব্যাকুলতা কানে বাজিতেছিল কি না, তাই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল, জ্বর গায়ে উঠেছ যে ?

ঘরের কাজ করবে কে ?

ঝি আসেনি ?

ঝি রাঁধবে নাকি ?

বললাম একটা ঠাকুর রাখো—

নবাবের মতো কথা বলিস না অনু।

বোঝা গেল জ্বর যত না হোক, সাধনার রাগ হইয়াছে অনেক বেশি। রান্না শেষ হইয়া গিয়াছিল, নিজের জন্য সাধনা বার্লি জ্বাল দিতেছিলেন।

অনুপম একটু ভয়ে ভয়ে বলিল, নিমিকে কয়েকদিনের জন্য এনে রাখলে হত না ?

সাধনা বলিলেন, তুই কী ভাবিস বল তো ? এখানে এনে রাখবার জন্য আমি নিমির বিয়ে দিয়েছিলাম, না ?

এ কথার কোনো জবাব নাই, কারণ কথাটার পিছনে আরও অনেক কথা আছে। সাধনার বার্লি জ্বাল দেওয়া হইয়া গেলে অনুপম নিজেই একটা আসন পাতিয়া খাইতে বসিয়া গেল।

ভাত বাড়িয়া দিয়া সাধনা বলিলেন, আজ কত বছর বাইরে থেকে একটি পযসা ঘরে আসেনি, কখনও ভেবে দেখেছিস অনু ? উনি টাকার গাছ পুঁতে রেখে যাননি।

অনুপম নীরবে খাইয়া যায়।

এ ভাবে নষ্ট করবার মতো সময় কি তোর আছে অনু ? শঙ্করের সাজে, তার ঠাকুরদা বড়োলোক, তোর সাজে না। আরও পড়তে চাস পড়, ভবিষ্যতে যাতে উন্নতি হয এমন কিছু কবতে চাস কর, আমি যেভাবেই হোক চালিয়ে যাব। একটা মাস্টারি খালি আছে, তাই না হয় কবব কবছব। কিন্তু তুই যদি এ রকম উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে ঘুবে বেড়াস—

সাধনা ঢোক গিলিয়া বলেন, হাত গুটোস নে, খা। জ্বর গায়ে রেঁধেছি, না খেয়ে উঠলে ভালো হবে না বলে রাখছি।

সেদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া অনুপম অন্তত হাজারবার নিজের মনে প্রতিজ্ঞা কবিল যে, আর উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবে না। পরদিন বিকালে সে যে ভালো জামাকাপড় পরিয়া আশালতার বাড়িতে গেল, সেটা ঠিক উদ্দেশাহীন ঘুরিয়া বেড়ানোর পর্যায়ে পড়ে না। আশালতার বাড়িতে যাওয়াও তো একটা উদ্দেশ্য।

আজ আপনি আসবেন ভাবতেও পারিনি।

আশালতা যেন একটু ক্ষুব্ধ হইয়াছে। এ রকম ব্যাকুলভাবে তার কাছে যারা ছুটিয়া আসে, তাদের কাছে আশা করার যে কিছু নাই, অনেক অভিজ্ঞতায় আশালতার এইটুকু জ্ঞান জন্মিয়াছে। বাঁধা পড়িবার মতো ভদ্রতাজ্ঞান যাদের থাকে, একদিন সভায় কোনো মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হইলে পরদিনই তার বাড়ি গিয়া হাজির না হইবার মতো ভদ্রতাজ্ঞানও তাদের থাকে। চোরডাকাত ছাড়া সুযোগ পাওয়ামাত্র তৎক্ষণাৎ সুযোগ গ্রহণ করার প্রতিভা সরল, আদর্শে অনুরাগী, ন্যাচুরেল পোইজ্-বিশিষ্ট মানুষ কোথায় পাইবে ?

তবু, আদর-অভ্যর্থনার ত্রুটি আশালতা করিল না। বাড়িখানা ছোটো। ছোটো বসিবার ঘরখানাতে মোটামুটি একটু আধুনিকতা আমদানি করিতে গৃহকর্তার যে প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে, সেটা বেশ বোঝা যায়। কারণ, পুরাতন সোফাটিতে বসিলে জানালার ফাঁক দিয়া অন্দরের যেটুকু অংশ চোখে পড়ে, সেখানে বাড়ির লোকের আর্থিক অবস্থা ঢাকিবার কোনো প্রচেষ্টাই নাই।

জানালার ফাঁকটুকু কে যেন একফাঁকে বন্ধ করিয়া দিল।

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের এ-সব ফাঁকি অনুপমের জানা আছে, সে বিচলিত হয় না। সারা বছর যে বাড়ির মেয়েরা ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরিয়া বাসন মাজে, ঘর লেপে আর রান্না করে এবং অবসর সময়ে পরস্পরের চুলের অরণ্য হইতে উকুন বাছিয়া নখ দিয়া টিপিয়া টিপিয়া মারে, সেই বাড়ির মেয়েরা ঠাকুর দেখিতে যাওয়ার সময় অতি জমকালো শাড়ি অতি জমকালোভাবে পরিয়াছে দেখিলে যেমন অস্বাভাবিক মনে হয় না, গরিবের বাড়িতে বাহিরের ঘরের এই সস্তা বড়োলোকত্বের ভাবও তেমনই অনুপমের খাপছাড়া ঠেকে না। ইহাই নিয়ম, ইহাই প্রথা।

আপনার মা কেমন আছেন ?

মা ? মা ভালো আছেন।

অনুপম একটু বিস্ময়ের সঙ্গে আশালতার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। মুখখানা বড়ো গম্ভীর আশালতার।

তার সঙ্গে পরিচয় একদিনের, তার মাকে এখনও সে চোখে দেখে নাই। তার মার জন্য আশালতার এই আশ্চর্য দুর্ভাবনার কারণটা অনুপম ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

কিন্তু আশালতার মুখের গাম্ভীর্য ক্ষণস্থায়ী। অন্যমনে বিষাদের একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নিশ্বাসটা টানিবার সময়েই সে অপূর্ব কৌশলে হাসিয়া ফেলে, একটা কথা ভাবছিলাম।

তারপর প্রতি সপ্তাহে এক এক ধাপ করিয়া আশালতার সঙ্গে অনুপমের ঘনিষ্ঠতা বাড়িতে থাকে, ধাপগুলি অনুপমের অপরিচিত। কীসের সিঁড়ি বাহিয়া কোথায় উঠিতেছে সে বুঝিতে পারে না, কিন্তু সেই জন্যই উঠিতে যেন আরও মজা লাগে।

আশালতা তার সঙ্গে আলাপ করে নানা বিষয়ে—সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, সাহিত্য, কিছুই বাদ যায় না। এই সব আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে একটি-দুটি করিয়া সে প্রয়োজনীয় প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করে।

এবার কী করবেন ভাবছেন ?

অনুপম ভাসাভাসা ভাবে জবাব দেয়, কী আর করব, চাকরিবাকরি খুঁজছি। শুনিয়া আশালতা খুশি হইতে পারে না।

আরও পড়ুন না ? এখন চাকরি করলে তো কেরানিগিরি, না হয় মাস্টারি। বরাবর ভালো রেজাল্ট করে আসছেন, ফিউচারটা নষ্ট করবেন না।

আরও সপ্তাহখানেক অনুপম আসল অবস্থাটা গোপন করিয়া রাখে, তারপর কেন যে সব কথা খুলিয়া বলিয়া ফেলে, নিজেই বুঝিতে পারে না।

আশালতা গম্ভীর মুখে খানিকক্ষণ ভাবে। ভাবিতে ভাবিতেই অনুপমের চায়ের কাপে চুমুক দেওয়া চাহিয়া দেখে এবং একটি বিস্কুট নিজের হাতে তার মুখে তুলিয়া দেয়।

আপনার ঠাকুরদা আপনাদের ত্যাগ করেননি, আপনার বাবাই আপনার ঠাকুরদাকে ত্যাগ করেছিলেন, না ?

অনুপম নীরবে সায় দিয়া যায়।

আপনার ঠাকুরদা এখন আর আপনাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন না ? সাহায্য করতে চান না ?

চাইলে কি হবে ? মা রাজি নন।

আশালতা নিজের হাতে আর একখানা বিস্কুট অনুপমের মুখে তুলিয়া দেয়।

আপনি যদি আপনার ঠাকুরদার কাছে গিয়ে পড়ার জন্যে টাকা চান, দেবেন না ?

দেবেন, কিন্তু—

এমনিই যদি টাকা চান, দেবেন না ?

দেবেন, কিন্তু—

আপনি যদি গিয়ে বলেন, ঠাকুরদা, আমি বিলেত যাব আমায় হাজার দশেক টাকা দিন, একসঙ্গে নয়, দশ মাসে পাঁচ সাতশো করে দিন—তিনি দেবেন ? ,

দেবেন, কিন্তু—

কিন্তু কী ?

মা জানতে পারলে আমার মুখ দেখবেন না।

আশালতা মৃদু হাসিয়া বলিল, মা কখনও ছেলের মুখ না দেখে থাকতে পারে ? আপনি বড্ড ছেলেমানুষ।

অনুপম ঘাড় উঁচু করিয়া বলে, মার মনে আমি কষ্ট দিতে পারব না। তা ছাড়া বাবা মরবার সময় যা বলে গেছেন, তারও তো একটা দাম আছে ? আমি বরং সারাজীবন কেরানিগিরি করব, তবু ঠাকুরদার টাকা নিয়ে—

আশালতা শান্তভাবে বলে, ছি, তাই কি আপনি পারেন ? আপনাকে চিনি না আমি ? মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়ে জীবনে বড়ো হওয়ার চেয়ে কেরানিগিরি অনেক ভালো।

অনুপমের মুখে একটা কালোমেঘ ঘনাইয়া আসিতেছিল, সে মেঘ কাটিয়া যায়। পকেটে রুমাল খুঁজিতে খুঁজিতে আশালতা নিজের আঁচলে তাহার মুখ মুছাইয়া দিয়া চকিতে বাড়ি চলিয়া যাওয়ায় নিজেকে সে কৃতার্থও মনে করে।

সপ্তাহ দুই পরে একদিন ছাত্রসমাজের এক সাধারণসভায় আশালতার সঙ্গে হাজির হইয়া সে দেখিতে পায়, বক্তৃতামঞ্চে ছোটোবড়ো, চেনাঅচেনা নেতাদের মধ্যে শঙ্করও বসিয়া আছে।

ছাত্রসভা হইলেও ধরিতে গেলে এটা প্রকাশ্য জনসভা। এখানে কিছু বলিবার সাহসও অনুপমের ছিল না, সাধও ছিল না। ব্রহ্মানন্দের পাল্লায় পড়িয়া তাকে কিছু বলিতে হইল। ব্রহ্মানন্দ তাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়াই এক সময় উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিয়া দিল যে, আলোচ্য বিষয়ে শিক্ষা-সমাজ-সাহিত্য সংস্কার সমিতির মতামত সুবিখ্যাত ছাত্রনেতা শ্রীযুক্ত অনুপমবাবু সভায় ব্যাখ্যা করিবেন। ঘোষণা করিয়া আরক্ত মুখখানা অনুপমের মুখের কাছে আনিয়া চাপা গলায় সে বলিল, আপনার পদবিটা ভুলে গেছি। —বসে রইলেন যে ? উঠুন, বলুন কিছু ?

অনুপম ভয়ার্ত কণ্ঠে বলিল, আপনি সমিতির প্রেসিডেন্ট, আপনিই বলুন না ?

ব্রহ্মানন্দ ক্রোধে আরও লাল হইয়া বলিল, আমি বলতে পারলে কি আপনাকে বলতে বলতাম ? শিগগির উঠুন।

বলাটা ভালো হইল না অনুপমের। নিজের ভাঙা থামা থামা কথা শুনিতে শুনিতে নিজের কান দুইটি তাহার গরম হইয়া উঠিতে লাগিল। দু-একবার মনে হইল সভার ভিতর হইতে যেন দুই-চারটা টিটকারিও কানে আসিয়া বাজিতেছে। শিক্ষা, সমাজ ও সাহিত্য-সংস্কার সমিতির উদ্দেশ্য আর আদর্শ সম্বন্ধে যা মনে পড়িল, কয়েক মিনিটের মধ্যে কোনোরকমে তাই অতি দুর্বোধ্যভাবে ব্যাখ্যা করিয়া সে থামিয়া গেল।

বসিতে গিয়া দেখিল, আশালতার পাশে তার আসনটি ব্রহ্মানন্দ বেদখল করিয়া ফেলিয়াছে। কী যেন সে বলিতেছে আশালতাকে, আশালতা মুগ্ধ বিস্ময়ে তার সুন্দর মুখখানার দিকে চাহিয়া আছে। খানিক তফাতে বসিয়া অনুপম বিবর্ণ মুখে দুজনের দিকে চাহিয়া রহিল। রাগে দুঃখে অভিমানে তার মনে হইতে লাগিল, যে কোনো উপায়েই হোক তরঙ্গ আজ মহাশূন্যের যেখানে অদৃশ্য হইয়া মিশিয়া আছে সটান সেইখানে চলিয়া যায়।

অনুপমের মুখ দেখিয়া আশালতা ব্রহ্মানন্দের দিকে আরও খানিকটা ঝুঁকিয়া আরও খানিকটা নিবিড়ভাবে আলাপ জুড়িয়া দিল।

অনুপম উঠিয়া চলিয়া যাইবে ভাবিতেছে, এমন সময় বক্তৃতা দিতে উঠিল শঙ্কর। কী চমৎকার বক্তৃতাই যে শঙ্কর দিল ! কী হাততালিটাই থাকিয়া থাকিয়া সভায় উঠিতে লাগিল !

উঠুক, আশালতা অনুপমকে আগেই মারিয়া ফেলিয়াছে, এগুলি শুধু খাঁড়ার ঘা। তবু, মরা মানুষও যে খাঁড়ার ঘায়ে এত কষ্ট পাইতে পারে, তা কি অনুপম জানিত ! তাদের বাড়িতে চিলেকোঠার ঘরে সন্ধ্যার ঘনায়মান আবছা অন্ধকারে সীতা পিসিমা তরঙ্গ ও শঙ্করের সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিলেন, অনুপমের মনে পড়িয়া যায়। সেই শঙ্কর এমন চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে ? তাও আবার সেই সভায়, যেখানে খানিক আগে অতি সাধারণ কয়েকটা কথা বলিতে গিয়া সে লোক হাসাইয়াছে ! অনুপমের মনে হয়, এত ভালো করিয়া বলা যেন তাকে অপদস্থ করার জন্য শঙ্করের ইচ্ছাকৃত বাহাদুরি।

সভা ভাঙিলে আশালতা অনুপমকে বলিল, চলুন, আমরা যাই।

ব্রহ্মানন্দ বলিল, বাড়ি যাবেন তো ? চলুন আমি আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি।

আশালতা শুষ্কস্বরে বলিল, কিছু মনে করবেন না ব্রহ্মানন্দবাবু, আমাদের একবার মার্কেটে যেতে হবে।

ব্রহ্মানন্দ বলিল, আমিও তো মার্কেটে যাব।

আশালতা বলিল, আমরা একজনদের বাড়ি হয়ে যাব—আপনার সঙ্গে যেতে পারছি না।

কারও বাড়ি নয় মার্কেট নয়—মাঠ। ব্রহ্মানন্দকে প্রত্যাখ্যান করার মৃতসঞ্জীবনীতেও অনুপমের মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার হইতেছে না দেখিয়া আশালতা বলিল, এসো, একটু বসি।

একটা গাছের নীচে আবছা অন্ধকারে অনুপমের গা ঘেঁষিয়া বসিয়া সে বলিল, তুমি বড্ড ছেলেমানুষ।

সুতরাং দিন দশেক পরে আশালতার সঙ্গে অনুপমের বিবাহ হইয়া গেল।

অনুপম কিছুদিন অপেক্ষা করার কথা বলিয়াছিল, বলিয়াছিল, একটা চাকরিবাকরি ঠিক করে নিই আগে ?

আশালতা বলিয়াছিল, হবে, হবে, সব হবে।

কী যে হইবে জানিলে হয়তো অনুপম ভয়ে শিহরিয়া উঠিত, কিন্তু বিপদটা ঠেকাইতে পারিত কি না সন্দেহ।

## নয়

কিছুদিন সাধনার মনের মতো হইবার চেষ্টা করিয়া আশালতা দেখিল, কাজটা বড়ো কঠিন। সাধনার কাছে ফাঁকি চলে না। মানুষটা সহজ, শান্ত ও মমতাময়ী বটে, কিন্তু গোঁজামিলের ব্যাপারে বড়ো কড়া। খারাপ লোককে খারাপ লোক হিসাবে যদি বা খানিক কাছে ঘেঁষিতে দেন, ভালোমানুষ সাজিয়া আপন হইবার চেষ্টা করিলে খারাপ লোক তাঁর কাছে একেবারেই প্রশ্রয় পায় না।

মানুষ বশ করিবার যত উপায় জানা ছিল, তার সবগুলিই আশালতা খাটাইবার চেষ্টা করিয়া দেখিল। কিন্তু দেখা গেল, ফলটা আরও খারাপ হইয়াছে। কোনো চেষ্টা না করিলেই বরং ভালো হইত ; সাধনার মনের মতো হইতে গিয়াই সাধনার কাছে নিজের পরিচয়টা আরও বেশি পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছে।

নিজের বোকামিতে আশালতা ক্ষুব্ধ হয়, রাগও করে। রাগটা হয় তার সাধনার উপর। তার প্রত্যেকটি চালাকি ধরিয়া ফেলিবার মতো চালাক মানুষ যদি সাধনা হন, এ রকম সাদাসিধে সাধারণ ভালোমানুষ সাজিয়া থাকিয়া তার মনে ভুল ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া কি সাধনার উচিত হইয়াছে ? সে হইল পুত্রবধূ, একমাত্র ছেলের একমাত্র বউ, তাকে এ ভাবে ঠকানো কি ভালো ?

তাকে বিবাহ করার জন্যে সাধনার কাছে অনুপম ছেলেমানুষের মতো অপরাধী সাজিয়া থাকে দেখিয়াও আশালতার গা জ্বলিয়া যায়। কেন, তাকে বিবাহ করার জন্য সে কি অনুপমের পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছিল ? তার বয়স একটু বেশি, চালচলন সাধনার মনের মতো নয়, কিন্তু সে জন্য দায়ি কি সে ? নিজে দেখিয়া, নিজে পছন্দ করিয়া, নিজে ভালোবাসিয়া নিজে প্রস্তাব করিয়া অনুপম তাকে বিবাহ করে নাই ?

তা ছাড়া, ধরিতে গেলে সেই তো অনুপমকে অনুগ্রহ করিয়াছে। যেমন অবস্থা বাড়ির, তেমনই অবস্থা অনুপমের নিজের, জানিয়া-শুনিয়া সে অনুপমকে বিবাহ করিতে রাজি হইয়াছিল, এটাই কি তার অসাধারণ মহত্ত্বের পরিচয় নয়, তার বৃহৎ আত্মত্যাগের পরিচয় নয়, তার উদার প্রেমেব পরিচয় নয়—যে প্রেম মানবীকে দেবীতে পরিণত করে ?

কিন্তু যতই রাগ হোক, যতই গা জ্বালা করুক, বাহিরে তাহা প্রকাশ করিবার মতো বোকা আশালতা নয়। সাধনাকে জয় করিবার চেষ্টা সে ছাড়িয়া দেয় বটে, কিন্তু কোনো রকম বিরোধ সৃষ্টি করে না। ছেলের কীর্তিতে মর্মাহত সাধনার সমস্ত উপেক্ষা ও অবহেলা নীরবে সহ্য করিয়া যায়, মনের গোপন কোণে বিদ্বেষ জমাইয়া রাখে।

সাধনার স্বাভাবিক স্বচ্ছ প্রকৃতির দর্পণে নিজের হীনতা ও সংকীর্ণতা আশালতা বারবার প্রতিবিম্বিত হইতে দেখিতে পায়, কিন্তু সে জন্য সে বিশেষ বিচলিত হয় না। তার সর্বাপেক্ষা জ্বালা বোধ হয়, দৈনন্দিন জীবনের অতি সাধারণ, অতি সামান্য ঘটনায় অনুপমের জন্য সাধনার অগাধ বাৎসল্যের অতি সূক্ষ্ম ও পরোক্ষ অভিব্যঞ্জনা সে যখন অনুভব করিতে পারে।

মা ছেলেকে ভালোবাসিবে, এই সহজ সত্যটির বিরুদ্ধে আশালতার নালিশ নাই, অনুপমের জন্য সাধনার স্নেহ যখন স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়, তখন আশালতার কষ্টও হয় না, সাধনাকে শত্রু বলিয়া মনেও হয় না। কিন্তু সাধনার বাৎসল্যের সেই অভিব্যক্তিগুলি আশালতাকে একটা অদ্ভুত ও দুর্বোধ্য যন্ত্রণা দেয় যে অভিব্যক্তিগুলি একমাত্র বাৎসল্যের অন্তর্দৃষ্টি ছাড়া আর কোনো দৃষ্টিতেই ধরা পড়িবার নয়। তখন সাধনাকে আশালতার মনে হয় শত্রু, মনে হয় সাধনা যেন তার ব্যক্তিগত অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাকে বঞ্চিত করিয়া তার সর্বাপেক্ষা অমূল্য সম্পদটি আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছেন।

নিজের মনের এই ব্যাপারটা আশালতা ভালো বুঝিতে পারে না। সে জানে, তার কাছ হইতে অনুপমকে কাড়িয়া লইবার ক্ষমতা সাধনার নাই, সাধনাকে অনুপম যতই ভয় করুক, সাধনার মনে কষ্ট দিতে অনুপমের যতই আপত্তি থাক, মনের জোর অনুপমের নাই, সাধনার চেয়ে তাই অনুপমের উপর তার জোর অনেক বেশি। বউ ছেলেকে পর করিয়া ফেলিবে, শাশুড়ির এই আশঙ্কা যেমন বোঝা যায়, স্বামীর উপর শাশুড়ির কর্তৃত্ব বেশি বলিয়া বউয়ের হিংসাটাও তেমনই বোঝা যায়, কিন্তু স্বামীর জন্য শাশুড়ির স্বাভ'বিক বাৎসল্য বউয়ের মনে আগুন ধরাইয়া দেয়। কোন যুক্তিতে ?

বিশেষত বউ যখন জানে, যে দিন খুশি স্বামীকে দিয়া সে এই বাৎসল্যের অপমান করাইতে পারে ?

নিজের মনের এই দুর্বোধ্য রহস্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া যে কয়েকটা দিন আশালতা নিজের মধ্যেই রহস্যের একটা সমীচীন ব্যাখ্যা খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করে, সেই কয়েকদিন তাহার চালচলনে একটা অপরূপ স্বাভাবিক মাধুর্যের সঞ্চার হয়, যাহা সাধনাকে করিয়া দেয় অবাক এবং অনুপমকে করিয়া দেয় আরও বেশি মোহাতুর।

কিছুদিনের জন্য আশালতা যেন নতুন মানুষ হইয়া যায়। অনুপমের মনে হয়, ক্রমাগত তাকেই গ্রহণ করিয়া চলিবার প্রক্রিয়াটা বন্ধ করিয়া আশালতা যেন এতদিনে নিজেকে দান করিতে শিখিয়াছে, কেবল তাকেই আদর না করিয়া তাব কাছ হইতেও আদর পাওয়ার প্রয়োজনটা একটু বুঝিতে পারিয়াছে।

একটু বুঝিতে পারিয়াছে, অতি সামান্য।

কিন্তু অনুপমের কাছে তাই যথেষ্ট। আশালতা তার মধ্যে যে মোহ জাগাইয়া দিয়াছিল, আশলতার কাছে সে তার তৃপ্তি পায় না, গভীর অতৃপ্তিতে দিন দিন তাহার মোহ তীব্র হইতে তীব্রতব হইয়া উঠে। আশালতা তাকে স্নেহ করে, সেবা করে, আদর করে, মাঝে মাঝে গভীর ও আন্তরিক আবেগে তাকে অভিভূত করিয়া দেয়, হাসিমুখে তার সমস্ত দাবি মিটাইয়া চলে—তবু অনুপমের মনে হয়, কিছুই যেন আশালতা তাকে দিতেছে না, সব দিক দিয়া তাকে বঞ্চিত করিয়া চলিযাছে।

কী সে চায আশালতার কাছে ও কী সে পায় না, কেন একটা মর্মান্তিক অতৃপ্তির যন্ত্রণা ধারালো অস্ত্রের মতো মনকে তাহার ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেয, অনুপম তাহা বুঝিতে পারে না। সময় সময় তাব মনে হয়, আশালতা যেন ঠিক তার বউ নয়, বউয়ের মুখোশ পরিয়া অন্য একটা সম্পর্ক পাতিবার জন্য আশালতা তার শয্যাপার্শ্বে নিজের স্থান করিযা লইয়াছে। এ জগতে মানুষের যত আত্মীয়া থাকা সম্ভব, মা-বোন-মাসি-পিসি, আশালতা যেন তাই, তার উপরে সে বান্ধবী, তারও উপবে সে নিষ্প্রাণ নিস্পন্দ একটা মাংসপিণ্ড। আর কিছুই নয !

গভীর রাত্রি। শহবের আওয়াজ মৃদু হইয়া আসিবার স্তব্ধতা।

আশালতার অতি কোমল, অতি মৃদু মিনতিব আজ্ঞায় ঘুম আসিবে না জানিয়াও অনুপম আশালতাব কোলে মাথা রাখিযা শুইয়াছে। বেশি রাত জাগিলে মানুষের শরীব খারাপ হয।

আশালতা কথা বলে, চুলের মধ্যে অঙ্গুলি চালনা কবে, নিবিড় মমতায় স্তিমিত চোখে মুখেব দিকে চাহিয়া মৃদু ও অপূর্ব হাসি হাসে। অনুপমও কথা বলে, একহাতের আঙুল দিয়া অপর হাতের আঙুলগুলিকে বন্দী করিয়া দুটি হাতকেই বুকের কাছে জড়ো কবিযা রাখে, প্রায অপলক চোখে আশালতার মুখের দিকে চাহিযা থাকে। দেয়ালে লটকানো বিদ্যুৎ আলো হইয়া আশালতাব মুখে আসিয়া পড়িতে থাকে অবিরাম, মুখের একপাশে থাকে মুখের ছায়া, নাকের পাশে থাকে নাকের ছাযা, আধঢাকা চোখে থাকে চোখের পাতার ছায়া—আলোছায়ায় আশালতার মুখখানা অতি ভয়াবহ মনে হয়। অনুপম শিহরিয়া উঠে। সে যেন এক কান দিয়া আশালতার কথার মৃদু গুঞ্জন শুনিতে পায়, অপব কানটিতে সেই গুঞ্জনের সুর কাটিয়া কাটিয়া কে যেন বলিয়া চলে, এ তরঙ্গ নয়, এ তরঙ্গ নয়।

খানিক পরেই অনুপমকে ঘুমের ভান করিতে হইবে। আশালতা যে কথাই বলিযা চলুক, অনুপম জানে, মনে মনে সে আবৃত্তি করিতেছে 'ঘুম-পাড়ানি মাসিপিসি ঘুম দিযে যা'। ঘুমের ভান না করিয়া তার উপায় কী ! জোরে একটা নিশ্বাস টানিয়া সে চোখ বুজিয়া থাকিবে, খানিক অপেক্ষা করিযা আশালতা মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিবে, ঘুমোলে ?

সে সাড়া দিবে না।

আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া আশালতা বালিশ ঠিক কবিয়া সন্তর্পণে তাব মাথাটি বালিশে নামাইয়া দিবে। আলো নিবাইয়া অধিকতর সন্তর্পণে পাশে শুইয়া পড়িবে।

অনুপমের মনে হইবে স্টেজের আলো নিবিয়া গেল।

অভিনয়-মঞ্চের আলো নেবে এবং জ্বলে, কিন্তু বক্তৃতামঞ্চে অনুপমের আনাগোনায় আশালতা যে যবনিকা টানিয়া দিল, তাহা আর উঠিল না। ব্রহ্মানন্দ একদিন অনুপমকে ডাকিতে আসিযা মুখ রক্তবর্ণ করিয়া ফিরিয়া গেল, আর একদিন ডাকিতে আসিয়া সে পড়িল আশালতার পাল্লায়।

আপনাদের ও সব ছ্যাবলামিতে যোগ দেবার সময় আমারও নেই, ওঁরও নেই, ব্রহ্মানন্দবাবু।

ছ্যাবলামি ! আপনি—আপনি— বক্তব্যটা শক্ত জিনিসের মতো ব্রহ্মানন্দের গলায় আটকাইয়া গেল।

চা খাবেন ?

চা না খাইয়াই ব্রহ্মানন্দ বিদায় গ্রহণ করিল এবং কয়েকদিন পরে অনুপমের নামে একখানি বেনামি চিঠি আসিল। চিঠিতে 'দি স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন ফর দি প্রোটেকশন অব এভরিবডিজ রাইটস ইনক্লুডিং স্টুডেন্টস'-এর প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক সরসীলাল ভাদুড়ীর নামের সঙ্গে আশালতার নাম জড়াইয়া কয়েকটা কথা লেখা ছিল।

আশালতা বলিল, দেখি কার চিঠি ?

আগাগোড়া চিঠিখানা পড়িয়া সে হাসিয়া ফেলিল।

উঃ, কী শয়তান ছেলে ! সেদিন অপমান করে তাড়িয়ে দিলাম কি না, তাই শোধ নিচ্ছে। কার হাতের লেখা জান ? ব্রহ্মানন্দের।

অনুপমের মুখ গম্ভীর হইয়াছে দেখিয়াও সে নিজের হালকা পরিহাসের ভঙ্গি ত্যাগ করিল না, বলিল, কিগো, দাঁড়িয়ে রইলে যে ? যাও, খোঁজ নিয়ে এসো গে ?

অনুপম বলিল, ধেৎ।

আদর্শের হিসাবে জীবনের মূল্য ক্রমে ক্রমে কমিয়া যাইতেছিল, কিন্তু জীবন যে এত সস্তা হইতে পারে কিছুদিন আগেও অনুপমের এ ধারণা ছিল না। তরঙ্গের আত্মহত্যার পর হইতে আদর্শের নামে যে অবাস্তব স্বপ্নের রঙিন প্রতিবিম্বগুলি জীবন হইতে একটির পর একটি মুছিয়া যাইতেছিল, সেগুলির প্রতি অনুপমের মমতা বড়ো কম ছিল না। কেবল তার নিজের নয়, তার পরিচিত ভালোমন্দ সকল মানুষের জীবন যে আদর্শের রঙে রঙিন করা হইয়াছে, সেগুলির রং এত কাঁচা কেন যে, বাস্তব জীবনের সামান্য একটু স্পর্শ পাইবামাত্র রং উঠিয়া কুশ্রী হইয়া যায়, এতবড়ো একটা প্রশ্নের জবাব আবিষ্কার করিবার মতো মাথা অনুপমের ছিল না, কিন্তু প্রশ্নটা একটা অস্পষ্ট রূপ ধরিয়া মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল। আজ হঠাৎ তাহার মনে হইল, প্রশ্নটার জবাব কি এই যে, মানুষের জীবনে আজ মনুষ্যত্ব শিথিল হইয়া গিয়াছে।

তারপর একদিন সাধনা বলিলেন, অপরাধী সেজে থাকলে তো চলবে না অনু, কিছু করতে হবে। কী করবি ভেবেছিস ?

অনুপম কী করিবে সে ভাবনা অনুপমের হইয়া আশালতা আগাগোড়া ভাবিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল এবং অনুপমকেও প্রায় সেইভাবেই ভাবিতে শিখাইয়া আসিয়াছিল। মনে মনে অনুপম জানে, আশালতা যাহা স্থির করিয়াছে, তাই তাকে শেষ পর্যন্ত করিতে হইবে, তবু সাধনাকে স্পষ্ট করিয়া কিছু বলিবার সাহস তাহার হইল না।

ভাবছি। এখনও কিছু ঠিক করিনি।

ঠিক তুই কোনোদিন করতে পারবি না। তোর একটুও মনের জোর নেই অনু।

বড়ো শ্রান্ত মনে হয় সাধনাকে, বড়ো অসহায় মনে হয়। মানুষটার গায়েও যেন এতটুকু জোর নেই, মনেও এতটুকু জোর নাই। জীবনযুদ্ধে এতদিনে তিনি যেন একেবারে হার মানিয়াছেন—যুদ্ধের শেষে যখন জয়গৌরব লাভ করিবার কথা ঠিক তখন। স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে আজ পর্যন্ত ধরিতে গেলে তিনি একরকম তপস্যা করিয়াছেন বইকী—আত্মনির্ভরশীলতার তপস্যা, স্বামীর ইচ্ছাপালনের তপস্যা, বীরেশ্বরের আশ্রয়ে গিয়া দাঁড়াইবার প্রলোভন জয় করিবার তপস্যা। এমনভাবে সাধনা অনুপমের মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন যে মনে হয়, অনুপমের দাম কষিয়া তিনি যেন ব্যাকুলভাবে

নিজের সুদীর্ঘ ও কঠোর ব্রতপালনের সার্থকতা যাচাই করিতেছেন, সবটাই যে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, কোনোমতেই তাহা যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না।

তুই যে কী করে এমন হয়ে গেলি অনু !

অনুযোগের চেয়ে কথাটা আপশোশের মতোই শোনায় বেশি। নিজেকেই যেন তিনি উদ্‌ভ্রান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এত করলাম তবু ছেলেকে আমি মানুষ করতে পারলাম না কেন ? কেন আমার এতদিনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল ?

অনুপমের মন খারাপ হইয়া যায়। কেবল আশালতার জন্যই যে সাধনা হঠাৎ তাহাকে অমানুষ মনে করিতে আরম্ভ করেন নাই, এমন স্পষ্টভাবে অনুপম তা জানে যে, অন্ধভাবে আশালতাব পক্ষ সমর্থন করিয়া সাধনার উপর একটু বিরক্ত হইয়া উঠিবার সুযোগটা পর্যন্ত গ্রহণ করিতে পারে না। খানিক ইতস্তত করিয়া সে চলিয়া যায় নিজের ঘরে। দেখা যায় সেখানে ওত পাতিয়া বসিয়া আছে আশালতা।

মা কী বলছিলেন ?

শিব গড়তে কেন বাঁদর গড়লেন, তাই জিজ্ঞাসা করছিলেন।

চোখের পলকে আশালতা বুঝিতে পারে, অনুপম রাগ করিয়াছে। কিন্তু কার উপর রাগ করিয়াছে বুঝিতে পারে না।

মাকে বলেছ বুঝি ?

না। আমি বলতে পারব না।

শুনিযা আশালতা রাগ কবে না। শিশুর অবাধ্যতাকে প্রশ্রয় দিবার ভঙ্গিতে মৃদু একটু হাসিয়া বলে, বড়ো ছেলেমানুষ তুমি ! একটুতে মন বিগড়ে যায়।

সাধনা মনে করেন অপদার্থ, আশালতা মনে করে ছেলেমানুষ। এদের কাবও মনে করার সঙ্গে অনুপমের নিজের ধারণা মেলে না। নিজেকে তার মনে হয় একটা রূপধরা ফাঁকি, যার মধ্যে অপদার্থতাও নাই, ছেলেমানুষিও নাই।

বীরেশ্বরের সঙ্গে আশালতার বার চারেক দেখা হইয়াছে। দুবার বীরেশ্বর এ বাড়িতে আসিয়াছেন, দুবার সকলকে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। বীরেশ্বরকে যতটুকু চেনা দরকার, চারবার দেখিয়াই আশালতা চিনিয়া ফেলিয়াছে, ও দিক দিয়া তার কোনো ভয় নাই। তার ভয় শুধু সাধনাকে। তবে অনুপমের কাছে সাধনার অদ্ভুত মনের জোর ও একগুয়েমির কাহিনি শুনিতে শুনিতে সাধনার সম্বন্ধে তার যে রকম ভয় হইয়াছিল, এখন সে ভয় অনেক কমিয়া গিয়াছে। সে বুঝিতে পারিয়াছে, নিজের সঙ্গে লড়াই করিতে করিতে যে অবস্থায় মানুষ ভাঙিয়া পড়ে, সাধনা সেই অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া সাধনাকে আরও খানিকটা নির্জীব করিয়া আনিতে পারিলে ভালো হইত, কিন্তু ব্রহ্মানন্দের বেনামি চিঠির পর আর দেরি করিবার সাহস আশালতার হইল না।

একদিন বিকালের দিকে অনুপমকে সঙ্গে করিয়া সে বেড়াইতে বাহির হইল। বাহির হইল একটু সকাল সকাল, কারণ অনেক কিছু করিবার ছিল। পথে নামিয়া বলিল, পথেঘাটে কোথায় বেড়াব ? তার চেয়ে চলো আমরা দু-একজন বন্ধুর বাড়ি গিয়ে দেখা করে আসি। অনেকদিন দেখা হয়নি, বিয়ের সময়ও নেমন্তন্ন করিনি—নিশ্চয় ভারী ক্ষুণ্ণ হয়ে আছে।

সিনেমায় গেলে হত না ?

সিনেমায় আর একদিন যাব।

যে দুটি বাড়িতে যে দুটি পরিবারের মধ্যে আশালতা অনুপমকে টানিয়া লইয়া গেল, তাদের সঙ্গে আশালতার পরিচয় থাকা সম্ভব, বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকা সম্ভব নয়। সে সম্পর্ক যে আছে, তারও কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না। বরং আশালতার মতো মেয়েকে একদিন চা-পানের নিমন্ত্রণ করিযাই যে কৃতার্থ করিয়া দেওয়া যায়, দুটি পরিবারের একজনেরও, এমন কী খানসামা বেয়ারাগুলির পর্যন্ত, এই জ্ঞানের কিছুমাত্র অভাব আছে বলিয়া মনে হইল না। আশালতা নিজেও আজ সাজগোজ করে নাই, অনুপমও করে নাই। নিজের স্বপ্ন-জীবনের এই দুটি প্রায়-অভিন্ন আবেষ্টনীর মধ্যে নরম আসনে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া মার্জিত কণ্ঠের ভাসাভাসা ভাঙাভাঙা ভদ্রতার আলাপ শুনিতে শুনিতে অনুপমের মনে হইতে লাগিল, সুদৃশ্য অ্যাশ ট্রে পর্যন্ত যেন সস্ত্রীক অনুপমবাবুকে ব্যঙ্গ করিতেছে।

দুনম্বর বাড়িটির গেট পার হইয়া দুপাশের সম্ভ্রান্ত বাড়িগুলির মধ্যে পিচঢালা পরিচ্ছন্ন পথ ধরিয়া দুজনে ট্রামলাইনের দিকে হাঁটিতে লাগিল।

আশালতা অনুপমের মুখের ভাব লক্ষ করিতেছিল, এক সময় মৃদুস্বরে বলিল, গাড়ি কবে বাড়ি পৌঁছে দেবার কথা বলল—ঠিক একটিবার ! জানে যে প্রথমবার ভদ্রতা করে আমরাও বলব, গাড়ির দরকার নেই। আর একবার যদি বলত, আমি ঠিক বলে বসতাম, এত করে যখন বলছেন, মেনি থ্যাঙ্কস।

অনুপম ঝাঁঝালো সুরে বলিল, হাঁটতে তোমার কষ্ট হচ্ছে নাকি ?

হাঁটতে আবাব কী কষ্ট ?—মজা করে খানিকক্ষণ দামি গাড়িতে চড়ে নিতাম !

দামি গাড়িতে চড়লেই মানুষ সুখী হয় না।

আশালতা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তা ঠিক। সুখী হওয়া অ্যাতো কঠিন !

তারপর আরও খানিকক্ষণ রাশ আলগা দিয়া শহরতলির হ্রদের ধারে অনুপমকে একটা পাক খাওয়াইয়া এক সময় আশালতা আবার রাশ টানিয়া ধরিল এবং সন্ধ্যার পরেই অনুপমকে হাজিব করিয়া দিল বীরেশ্বরের কাছে।

সমস্ত শুনিয়া বীরেশ্বব বলিলেন, এ বুদ্ধি তোকে কে দিল অনু ?

কেউ বুদ্ধি দেযনি, নিজের ফিউচার ঠিক করে নেবার বয়স আমার হয়েছে ঠাকুরদা।

কথা শুনে কিন্তু তা মনে হচ্ছে না। তোর বিলেত যাওয়ার মানে হয়, বউকে সঙ্গে নিয়ে যাবার তোর কী দরকার ?

এ প্রশ্নের জবাব আশালতা অনুপমকে শিখাইয়া রাখিয়াছিল। মুখ কালো করিয়া সে বলিল, কারণ আছে। আপনাকে বলতে পাবব না ঠাকুরদা।

বীরেশ্বরও মুখ কালো কবিয়া বলিলেন, আমার টাকায় দুজনে বিলেত যাবি, আমাকে বলতে পারবি না ?

অনুপম বলিল, না।

বীরেশ্বর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিলেন। তারপব মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না ঠিক আমার টাকা নয়। তুই তোর বাবার টাকা দাবি করছিস, না অনু ?—রাগ করে আমায় ত্যাগ না করলে শঙ্করের বাবার মতো তোর বাবার জন্যে আমাকে যে টাকাটা খরচ করতে হত সেই টাকাটা, না ? আমি না মরলে আমার যা কিছু আছে, তার ভাগ পাবি না জানিস বলে তোর বাপের কাছে যে টাকাটা ধারি, তাই আদায় করতে এসেছিস, কেমন ?

অনুপম ব্যাকুল হইয়া বলিল, না ঠাকুরদা, না। সত্যি তা নয়, আপনার কাছে সাহায্য চাইছি।

তোর মার কথাটা ভেবেছিস অনু ?

মা অবশ্য একটু রাগ করবেন—

একটু রাগ নয়, হয়তো জীবনে তোদের মুখ দেখবেন না।

কিন্তু মার জন্যে আমার ফিউচারটা তো নষ্ট করতে পারি না—

বীরেশ্বর হঠাৎ রাগিয়া আগুন হইয়া বলিলেন, নিজের মাকে বাদ দিয়ে মানুষের ফিউচার কী রে বাঁদর ? মার জন্য একদিন তোর বাবা আমার টাকার লোভ ত্যাগ করেছিল, সেই টাকার লোভে আজ তুই তোর মাকে ত্যাগ করছিস। বউমা তোকে মানুষ করতে পারেননি অনু।

অনুপম তা জানে।

রাগটা কমিতে কিছু সময় লাগিল বীরেশ্বরের। তারপর ঠিক যেন সাধনার মতো শ্রান্ত ও অসহায়ভাবে বলিলেন, চাইছিস যখন, টাকা আমি দেব অনু। না দিলেই বা বউমার কী লাভ হবে, যেভাবেই হোক বউমাকে তোরা মেরে ফেলবিই।

বীরেশ্বরের ঘর হইতে বাহির হইয়া অনুপম বারান্দায় একটু দাঁড়াইল। রামলালের ঘর অন্ধকার, এখনও তিনি রেস্তোরাঁয় রুগ্‌ণ জীবনের দৈনন্দিন ঔষধের বোতল খালি করিয়া বাড়ি ফেরেন নাই। শঙ্করের ঘরও অন্ধকার। বাড়ির মেয়েরা কেউ চলাফেরা করিতেছে, কেউ শিশুদের ঘুম পাড়াইতেছে, কেউ নভেল পড়িতেছে। ছেলেমেয়েরা করিতেছে স্কুলকলেজের পড়া। সকলের জন্য রান্নাঘরে প্রস্তুত হইতেছে খাদ্য।

বারান্দার শেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়া সীতা পিসিমা আশালতাকে চুপিচুপি কী যেন বলিতেছেন। কে জানে তরঙ্গের জীবনকাহিনি কী না ! তরঙ্গ যে ঘরে গলায় দড়ি দিয়াছিল, বারান্দায় ওই প্রান্তেই সেই ঘরে উঠিয়া যাইবার সিঁড়ি আরম্ভ হইয়াছে। গভীর মনোযোগের সঙ্গে সীতা পিসিমার কথা শুনিতে শুনিতে আশালতার মাথার আঁচল খুলিয়া পড়িয়াছিল। তরঙ্গের মতো চুল তাহার নাই, তবু কী কৌশলে যেন চুলগুলিকে ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া প্রায় তরঙ্গের মতোই মস্ত একটা খোঁপা বাঁধিয়াছে। এতদূরে দাঁড়াইয়া ক্ষীণ আলোকে পাশের দিক হইতে আশালতার মুখখানা দেখিয়া অনুপমের হঠাৎ মনে হয়, তার মুখের একধারে যেন তরঙ্গের মুখের মরণের বিবর্ণ বিসদৃশ মুখোশের একটা টুকরা কে আঁটিয়া দিয়াছে।

আশালতার সঙ্গে বাড়ি ফিরিবার সময় আশালতার মুখ না দেখিবার জন্যই অনুপম জোর করিয়া পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

বাড়ি পৌঁছিয়া সাধনার মুখের দিকেও অনুপম চাহিতে পারিল না, কিন্তু তাহা অন্য কারণে। ভবিষ্যৎ জীবনকে কীভাবে গড়িয়া তুলিবে, আশালতার সঙ্গে সে বিষয়ে অনেক জল্পনাকল্পনা করিয়াছে ; আজ এইমাত্র আশালতার সেই পরিকল্পনা সফল করিবার সবচেয়ে দরকারি ব্যবস্থাটা সে করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আজই তাহার বেশি করিয়া মনে হইতেছে যে, সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবনটা এতদিনে সে সম্পূর্ণরূপে উদ্দেশ্যহীন করিয়া দিল ! এতদিন ছোটো ছোটো উদ্দেশ্যহীন কাজ করিয়া দিন কাটাইয়াছে, এইবার আড়ম্বরের সঙ্গে জীবনের সবচেয়ে বড়ো উদ্দেশ্যহীন কাজটা আরম্ভ করিবে এবং সেই সঙ্গে উদ্দেশ্যহীন করিয়া দিবে সাধনার অতীত ও ভবিষ্যৎ জীবন। এতদিন অনুপমের মনের কোণে আত্ম-সান্ত্বনার প্রয়োজনে একটা আশা ছিল। সাধনা তাকে মানুষ করিতে পারে নাই, সে অমানুষ, কিন্তু হয়তো একদিন মানুষ হইতে পারিবে, সন্ধান পাইবে জীবনের উদ্দেশ্যের, খুঁজিয়া পাইবে পথ। তারপর যেদিন সে মানুষ হইতে পারিবে, সেদিন প্রমাণ হইবে, সাধনার জীবনটাও ব্যর্থ হইয়া যায় নাই।

আজ সেই যুক্তিহীন আশা অনুপমের মনে আত্মহত্যা করিয়াছে।

সাধনা রোয়াকে বসিয়াছিলেন। একা। ঠিকা ঝি কাজ সারিয়া চলিয়া গিয়াছে। রান্না শেষ করিয়া সাধনা শূন্যগৃহ আগলাইয়া বসিয়া আছেন।

এত রাত হল যে অনু ?

অনুপম কতদূর উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে আশালতা তাহা জানিত, তাকে শান্ত হইবার, ভাবিবার সময় না দিয়া আজই সমস্ত ব্যাপারটা চুকাইয়া ফেলিবার জন্য অনুপমের হইয়া সে জবাব দিল, ও বাড়িতে গিয়েছিলাম মা।

আজ সাধনাকে কিছু বলিবার ইচ্ছা বা সাহস কিছুই অনুপমের ছিল না। ও বাড়িতে তাহারা কেন গিয়াছিল সাধনার এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়া এবং আশালতার দুটি-একটি মন্তব্যের জের টানিতে গিয়া সব কথাই সে বলিয়া ফেলিল।

সাধনা মড়ার মতো বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলেন। পরদিন সকালে ছোটো একটি বাক্‌সো সঙ্গে করিয়া চলিয়া গেলেন দেশে। একা।

খানিক পরে শরু হইল বীরেশ্বর ছাড়া ও বাড়ির সকলের আবির্ভাব। একটু আভাস পাইয়া সকলে ব্যাপারটা ভালো করিয়া বুঝিতে আসিয়াছে। বাপের টাকার ভাগটা অনুপম দাবি করিয়াছে এবং তাহার দাবি মঞ্জুর হইয়াছে শুনিয়া মুখ কালো করিয়া সকলে ফিরিয়া গেলেন। সীতা পিসিমা প্রায় কাঁদিয়া ফেলিবার উপক্রম করিলেন।

শঙ্কর আসিল দুপুরবেলা।

আশালতাই সকলকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল, শঙ্করকেও সেই অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। অনুপম একটি কথা বলিল না।

শঙ্কর বলিল, এক গ্লাস জল দিন তো, বড়ো তৃষ্ণা পেয়েছে।

আশালতা বলিল, শরবত খাবেন ? আমি যে শরবত তৈরি করি—একেবারে অমৃতের মতো।

আশালতা অমৃতের মতো শরবত তৈরি করিয়া আনিতে গেল এবং শঙ্কর ও অনুপম চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল পরস্পরের মুখের দিকে।